বিদ্যাসাগর

সন্তোষকুমার অধিকারী

কলকাতা * এলাহাবাদ * বোম্বাই * দিল্লী

প্রথম সংস্করণ : এক হাজার
: সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯

প্রকাশক :
ডি. মেহ্‌রা
রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২
৯৪ সাউথ মালাকা, এলাহাবাদ-১
১১ ওক্ লেন, ফোর্ট, বোম্বাই-১
৩৮৩১ পাতৌদি হাউস রোড, দরিয়াগঞ্জ, দিল্লী-৬

প্রচ্ছদশিল্পী :
ইন্দ্র দুগার

মুদ্রক :
শ্রীকালীচরণ পাল
নবজীবন প্রেস
৬৬ গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা-৬

সূচী ঃ

পৃষ্ঠা

পরিশিষ্ট ঃ

হডসন অঙ্কিত প্রতিকৃতি অবলম্বনে

পটভূমিকা

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ ইতিহাসকারদের কাছে নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। যে ফরাসী বিপ্লব সমগ্র ইউরোপের মনোভূমিতে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল, তার সূচনা ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে। তার মাত্র কিছুদিন আগে পর্যন্ত (১৭৭৮ খৃঃ) রুশো ও ভলতেয়ার দুজনেই বেঁচে ছিলেন। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের ভারতবর্ষ এক নতুন স্পন্দন অনুভব করলো রামমোহনকে জন্ম দিয়ে। আর ইউরোপে জন্ম নিলেন অগাস্টাস কোঁতে ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপে পুনরুজ্জীবনের যে তুফান উঠেছিলো তারই একটি প্রবল ঢেউ ভিন্ন রূপ নিয়ে সেদিন ভারতবর্ষেও এসে আঘাত করেছিল—মাত্র কিছুদিনের ব্যবধানে। প্রাচীন পৃথিবীর সংস্কারজীর্ণতাকে ছিন্ন করে অবমানিত ও নির্যাতিত মানবাত্মার অভ্যুত্থান ঘটতে শুরু করেছে। একমাত্র সত্য ঈশ্বর, এবং মানুষ ভাগ্যের হাতে অন্ধ ক্রীড়নক—এই প্রাচীন চিন্তার বাঁধনকে সরিয়ে মানুষকে সবার ওপরে এবং সবচেয়ে বড় করে দেখাবার যে আগ্রহ, সে আগ্রহের বনিয়াদ এইযুগেই সৃষ্টি হয়েছে। নবমানবতাবাদের এই ঢেউ ইউরোপ থেকে অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দেই জন্ম আব্রাহাম লিঙ্কনের, যিনি আমেরিকা থেকে দাসত্ব-প্রথার বর্বরতাকে উচ্ছেদ করতে আত্মবিসর্জন দিলেন। ১৮১৮ থেকে ১৮২১ যেন পৃথিবীর এক মাহেন্দ্রক্ষণ। এই চার বছরে মহৎ চিন্তানায়ক ও মানবপ্রেমী কয়েকটি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের জন্ম। ১৮১৮-তে কার্ল মার্কস, ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ওয়াল্ট্ হুইটম্যান ও জন রাস্কিন; এবং ১৮২০-তে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল, হার্বার্ট স্পেন্সার ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম। ১৮২১ খৃষ্টাব্দ অমর কথাসাহিত্যিক মানবতাবাদী ডস্টয়েভ্স্কির জন্ম দিল।

অনেকগুলি বিশিষ্ট ঘটনায় এই যুগ চিহ্নিত হয়ে আছে, মজাপুকুরের মত ধর্মের বিকৃত ব্যাখ্যা ও আচারপরায়ণতার পঙ্কে ভারতবর্ষ আকণ্ঠ নিমগ্ন হয়ে বসেছিল। উনবিংশ শতাব্দীতেই পুনরুজ্জীবন (Renaissance), ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা, ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড আমহার্স্টের কাছে লেখা রামমোহনের চিঠি এবং ১৮২৪-এ সংস্কৃত কলেজের সৃষ্টি এদেশের শিক্ষাজগতে যুগান্তকারী ঘটনা। হিন্দু কলেজের রিচার্ডসন ও ডিরোজিও ছাত্রজগতে দুর্বার আবেগের সৃষ্টি করেছিলেন তারই ফলশ্রুতি নব্যবঙ্গের দল। তারুণ্যের আলোড়নে স্ফীত হয়ে তারা সমাজদেহকে বিধ্বস্ত করতে চেয়েছিল। বিপরীতমুখী ও বৃহত্তর এক আন্দোলনের সৃষ্টি হলো যেদিন রামমোহন ব্রাহ্মসমাজের ভিত্তিস্থাপন করলেন (১৮২৮ খৃষ্টাব্দে)। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে দূর ইউরোপের একটি দেশ গ্রীসের বন্ধনমুক্তি ঘটলো। আর সেই বছরেই সম্পূর্ণ অপরিচিত এক বীরসিংহ গ্রাম থেকে ন'বছর বয়সের এক বালককে দেখা গেল হেঁটে চলতে; পথের মাইলস্টোন থেকে ইংরাজী সংখ্যাগণনা শিখতে শিখতে কলকাতার দিকে সে হেঁটে চলেছে। কে সেদিন জেনেছিল যে, সেই বালক ভারতবর্ষের সমাজকে একদিন তার মানবতার অনুভবে নতুন করে সৃষ্টি করবে?

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে রামমোহন রায় ব্রিস্টলে দেহ রাখলেন। তখন ভারতবর্ষের বিচ্ছিন্ন ও কোলাহলপূর্ণ অঙ্গনে ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্র তপস্যারত। তিনি দেখেছেন ডিরোজিওর নবজীবনের স্রোতকে তাঁর চারপাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যেতে। রামমোহনের দুর্জয় ব্যক্তিসত্ত্বার প্রভাব তাঁর শরীরেও শিহরণ তুলেছে। সংস্কৃত শিক্ষার মাধ্যমে ভারত-মানসের প্রজ্ঞা তাঁর হৃদয়গত। ইংরাজী ভাষার পথ বেয়ে ইউরোপের ইতিহাস তাঁর চিন্তায় বিস্তৃত। আচার ও অনুষ্ঠানের অঙ্কুশাঘাতে বিদ্ধ নির্যাতিত মানবাত্মার ব্যাকুল আর্তি তাঁর রক্তে রক্তে বিধৃত। কালিদাসের শকুন্তলা ও ভবভূতির উত্তর রামচরিতের সঙ্গে তিনি সাগ্রহে পড়েছেন ব্রন্টি, ফ্লবার্ট ও ডস্টয়েভ্স্কির উপন্যাস। একদিকে জেনেছেন গৌতম বুদ্ধের জীবন ও বৌদ্ধ বিপ্লবের কাহিনী অন্যদিকে পড়েছেন কার্লাইলের ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস। হিন্দু-দর্শন ও শাস্ত্র যেমন আকণ্ঠ পান করেছেন তেমনি ডুবেছেন গ্রীস দর্শনের মধ্যে। তাঁর নিত্য সহচর হয়েছে

বিদ্যাসাগর

স্কিন ও কোঁতের গ্রন্থগুলি। শিক্ষাকে উদার ও সর্বজনযোগ্য করবার জ্য, সমাজকে মানবমুখী ও কল্যাণকর করে তুলবার জন্য, ধর্মকে মানুষের য়ে দেখবার জন্য এক নতুন উদ্‌বেগ তাঁর রক্তে বিপ্লবের প্রস্তুতিতে বাঁধতে শুরু করেছে।

সমগ্র ভারতবর্ষ সেদিন বাংলাদেশের মুখের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা ছিল।

ইস্ট্‌ ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই বাংলাদেশেই প্রথম নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলো। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস্‌ যখন গভর্নর জেনারেল হলেন এবং ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে এই কলকাতাতেই একটি সুপ্রিম কোর্টের প্রতিষ্ঠা হলো তখন থেকেই কলকাতা ভারতবর্ষের প্রধান শহররূপে গণিত হলো। ইংরাজ তার শাসনকার্য শৃঙ্খলায় সঙ্গে চালানোর জন্য সেদিন দেশীয় লোকদের সঙ্গে যেমন যোগাযোগ স্থাপন করলো তেমনি দেশীয় ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতিও আগ্রহান্বিত হয়ে উঠলো। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠার কারণই ছিল নবাগত ইংরাজ কর্মচারীদের ভারতীয়তার সঙ্গে পরিচিত করা। ইংরাজের সঙ্গে সঙ্গে এলো ইংরাজী ভাষা, শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাভঙ্গি। সেদিন ইংরাজ-শাসক ও মিশনারিরা ভেবেছিল যে, অশিক্ষিত পৌত্তলিক হিন্দুজাতিকে তারা ইউরোপীয় মনোভাবাপন্ন করে তুলবে। বস্তুতঃ প্রথমটা তাই ঘটতে চলেছিল। হিন্দু সমাজ ও ধর্মের নিগড় থেকে বেরিয়ে এসে কিছু লোক খৃষ্টান হতে আরম্ভ করেছিল, ঘৃণা করতে শুরু করেছিল হিন্দুয়ানিকে। রাজা রামমোহনের মত দুরন্ত প্রতিভা—যিনি নিজের মধ্যে প্রাচীন ভারতের প্রজ্ঞা ও আধুনিক ইউরোপের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার স্পৃহাকে সমন্বিত করেছিলেন—সেদিন এই জরাগ্রস্ত হিন্দু-সমাজকে উদ্ধার করবার মত আশায় নিজেকে উদ্দীপ্ত করতে পারেননি। কিন্তু তিনি জাতীয়তার বোধ এনে দিয়েছিলেন। সমুদ্র মন্থনে যেমন অমৃত ও গরল দুই উঠেছিল, ভারতবর্ষে ইংরাজী শিক্ষা ও ইউরোপীয় ভাবধারার প্রবাহে তেমনি সুদূরপ্রসারি ফল ফলেছিল। রাজা রামমোহনের চেষ্টায় ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলেও ইংরাজ শাসক ইংরাজী শিক্ষার ব্যাপক প্রচার হতে দিতে চাননি। ইংরাজী শিক্ষার প্রসারকে সম্ভব করেছিল লর্ড মেকলের উৎসাহ। যদিও মেকলে সেদিন

ভাবতে পারেননি যে, ইংরাজীশিক্ষিত ভারতবাসী এক নতুন জাতীয়
বোধের প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠবে।

এই হল ঐতিহাসিক পটভূমিকা। সামাজিক চালচিত্রও কম গুরু
নয়। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের কৌলিন্য নিয়ে জাত, পাণ্ডিত্য তাঁর স
সম্পদ। দারিদ্র্য, বেদনা ও কৃচ্ছ্রতার সাধনা তাঁর পারিবারিক জীব
মহনীয় করে রেখেছে। পিতামহী দুর্গাদেবী স্বামী নিরুদ্দেশ হয়ে
দুই পুত্র ও চার কন্যাকে নিয়ে বলরামপুরের শ্বশুরগৃহ ত্যাগ কর
হয়েছেন। পিতৃগৃহে আশ্রয় পেয়েও সে আশ্রয় তাঁকে ছেড়ে আসতে
হয়েছে। কারণ তাঁর ভাই তাঁর উপস্থিতিকে অবাঞ্ছনীয় মনে করেছেন।
খড়ের ঘরে পুত্রকন্যাকে নিয়ে দীনতা ও কৃচ্ছ্রতার মধ্য দিয়েই তিনি দিন
কাটিয়েছেন।

পিতা ঠাকুরদাসের অবস্থা আরও করুণ ছিল। উপার্জনের তাগিদে
চোদ্দ বছরের বালক কলকাতায় এসে পথে পথে ঘুরেছেন। রান্নার
কাজের বদলে একবেলা মাত্র খাওয়া জুটেছে। ক্ষুধায় আর্ত ঠাকুরদাস,
এক পয়সার জলখাবার খাওয়ার সামর্থ্য তাঁর হয়নি। যেদিন বড়বাজারের
ব্যবসায়ী ভাগবৎ সিংহের আপিসে দু'টাকা বেতনে একটি চাকরি পান,
সেই দিনটি তাঁর জীবনে সৌভাগ্যের স্মারক হয়ে থেকেছে।

ঈশ্বরচন্দ্র যখন সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হলেন ঠাকুরদাসের মাইনে তখন
আট টাকা। এই মাইনেতে কলকাতা ও বীরসিংহ দু'জায়গার খরচ
চালাতে হয়। জগদ্দুর্লভ সিংহের বাড়ীর নিচের তলায় একটি স্যাঁতসেতে
ও অন্ধকার ঘরে তাঁর আশ্রয়। চারপাশে নর্দমা থাকায় আরশোলাতে
ভর্তি। ঠাকুরদাস সকালেই কাজে বেরিয়ে যান, ফেরেন রাত বারোটায়।
বাজার করা উনুন ধরানো (কাঠের উনুন), রান্না করা—সবই সেই
বালক ঈশ্বরচন্দ্রকে করতে হতো। রাত্রে রান্না হয়ে গেলে তাঁর
পড়াশোনা করার সময়। সরষের তেলের প্রদীপে তিনি পড়তেন ; তেল
ফুরিয়ে গেলে রাস্তার আলোতে।

এই ভয়াবহ দারিদ্র্য তাঁকে মানুষের বেদনা ও অসহায়তা বুঝতে
সাহায্য করেছিল।

দারিদ্র্য ও কৃচ্ছ্রতার কঠোরতার মধ্যেও মানবতার স্বতঃস্ফূর্ত প্রস্রবনের
স্নিগ্ধ বারি এই পরিবারের ওপরে বর্ষিত হয়েছে। বিদ্যাসাগর তাঁর

আচরিতে সে-সব ঘটনার উল্লেখ করেছেন। সারাদিন অভুক্ত থেকে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লে ক্লান্তি ভুলবার জন্য ঠাকুরদাস মাঝে মাঝে গান শুরু করতেন। এমনই একদিন হাঁটতে হাঁটতে তিনি বড়বাজার ঠনঠনিয়ায় এসে পৌঁছলেন। তখন দুই পা তাঁর অসাড়। পেটে আগুন জ্বলছে। মুখে কথা নেই। ঠাকুরদাস চলৎশক্তিহীন।

সামনে মুড়ি-মুড়কির দোকানে এক বিক্রেতা নারী ঠাকুরদাসকে এই অবস্থায় দেখলেন। উঠে এসে ঠাকুরদাসকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি এমন করে দাঁড়িয়ে আছ কেন?

উত্তরে ঠাকুরদাস শুধু একটু জল চাইলেন। সেই নারী সহজাত-বোধ দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন যে, অনাহারের ক্লান্তিতে বালক আচ্ছন্ন। ঠাকুরদাসকে তখনই এনে বসালেন। তারপর দই কিনে এনে চিড়ে ও মুড়কি দিয়ে মেখে ঠাকুরদাসকে পেট ভরে খাওয়ালেন। এক অশিক্ষিতা ব্যবসায়ী নারীর করুণায় সেদিন ঠাকুরদাসের প্রাণ রক্ষা হয়েছিল। বিদ্যাসাগর এ কাহিনী চিরকাল মনে করে রেখেছিলেন।

আর একটি নারী বড়বাজারের জগদ্দুর্লভ সিংহের বোন রাইমণি। তাঁর কর্মক্ষেত্র থেকে একদিন বাসায় ফিরে ঠাকুরদাস দেখলেন যে, বালক ঈশ্বর পড়ার বই সামনে রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে। ক্রোধান্ধ হয়ে তিনি তাকে প্রচণ্ডভাবে মারতে লাগলেন। শব্দ শুনে রাইমণি দোতলা থেকে নিচে নেমে এলেন। ঈশ্বরকে বুকে জড়িয়ে ভেতরে নিয়ে গেলেন। এই রাইমণির অফুরন্ত স্নেহের নির্ঝরে তাঁর ছাত্রজীবন সিক্ত হয়েছে। পরবর্তী কালে এই রাইমণির উল্লেখ করে বিদ্যাসাগর বলেছেন—"আমি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী বলিয়া অনেকে নির্দেশ করিয়া থাকেন। আমার বোধহয় সে নির্দেশ অসঙ্গত নহে। যে ব্যক্তি রাইমণির স্নেহ-দয়া সৌজন্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং ঐ সমস্ত সদ্‌গুণের ফলভোগী হইয়াছে, সে যদি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী না হয়, তাহা হইলে তাহার তুল্য কৃতঘ্ন পামর ভূমণ্ডলে নাই।"

মানবতার সহজপ্রকাশের এই অনুভব বিদ্যাসাগরের চেতনাকে মানব-মুখী করে তুলেছিল।

জননী ভগবতী দেবীর চারিত্রিক প্রভাব সম্ভবতঃ তাঁর জীবনে সবচেয়ে বেশী কার্যকরী হয়েছিল। এই ভগবতী দেবী সাধক পুরুষের মেয়ে—

জীবনে দারিদ্র্যকে যেমন দেখেছেন, গ্রামের মানুষের অশিক্ষা ও অজ্ঞতা ব্যথাকে যেমন অনুভব করেছেন, তেমনি হৃদয়ে পেয়েছেন মানুষের জন্য অপরিসীম মমত্ববোধ ও সেবার আকাঙ্ক্ষা। সংস্কার তাঁর করুণার মহত্বকে খর্ব করেনি। পুত্রের জীবনের ওপর এই মহীয়সী নারীর প্রভাব শুধু একটি ঘটনাতেই পরিস্ফুট হয়ে উঠবে।

"একদিবস বীরসিংহ বাটির চণ্ডীমণ্ডপে উপবিষ্ট হইয়া অগ্রজ পিতৃদেবের সহিত বীরসিংহার বিদ্যালয়গুলির সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেছিলেন, এমন সময় জননীদেবী রোদন করিতে করিতে চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া একটি বালিকার বৈধব্য সংঘটনের উল্লেখ করতঃ দাদাকে বলিলেন—তুই এতদিন যে শাস্ত্র পড়িলি, তাহাতে বিধবাদের কোনও উপায় আছে কিনা ?"

[শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত বিদ্যাসাগর জীবন চরিত]

সম্ভবতঃ সেইদিনই বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহকে সমাজসম্মত করার সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ আজ থেকে একশো বছর আগে মেদিনীপুরে এসেছিলেন মিঃ হ্যারিসন। পুত্রের অনুপস্থিতিতে ভগবতী দেবী পল্লী-রমণী হয়েও সেদিন হ্যারিসন সায়েবকে তাঁর গৃহে আমন্ত্রণ জানাতে কুণ্ঠিত হননি। জননীর নির্দেশেই বিদ্যাসাগর ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে বীরসিংহ গ্রামে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কিছু পরে একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ও স্থাপন করেন। জননীর তত্ত্বাবধানেই তিনি দুর্ভিক্ষের দিনে গ্রামের নিরন্নদের ভোজনের ব্যবস্থা করেছিলেন।

দরিদ্রের প্রতি দয়া, পীড়িতের প্রতি মমতা, অসহায়া নারীর নির্যাতনে বেদনাবোধ তিনি জননীর কাছেই জেনেছিলেন। ভগবতী দেবীই প্রেরণা দিয়েছিলেন শিক্ষার প্রসারে, বিধবাবিবাহ প্রবর্তনে এবং বহুবিবাহ প্রথার উচ্ছেদের জন্য সংগ্রাম করতে। তাঁর সংস্কারমুক্ত হৃদয়ের প্রসারতার জন্য বিদ্যাসাগর জননীর কাছেই সবচেয়ে বেশী ঋণী।

ভবিষ্যৎ জীবনে যিনি বিদ্রোহী নায়ক নামে খ্যাত হয়েছিলেন, চরিত্রের অদম্য পৌরুষও তিনি উত্তরাধিকারসূত্রেই পেয়েছিলেন। স্মরণ রাখা দরকার যে, বংশগত চারিত্রিক ঔদ্ধত্যই তাঁর মানসিক দৃঢ়তা ও পৌরুষের মূল উপাদান। পিতামহ রামজয় শুধু সাংসারিক জীবন নয়, লোভ ও আরামের ঈপ্সাকেও জয় করেছিলেন। পিতামহী দুর্গা দেবী দারিদ্র্যের

দুঃখ পেয়েছেন কিন্তু কখনও মাথা নোয়াননি কারও কাছে। তিনি স্বগৃহ বা শ্বশুরের গৃহ ত্যাগ করেছেন এবং পিতৃগৃহও। সারাদিন হাতে সুতো কেটে সেই সুতো বিক্রি করে সংসার চালিয়েছেন। সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্রও তাঁর হাতে কাটা সুতোর মোটা কাপড় পরেই মাথা উঁচু করে চলেছেন। পিতা ঠাকুরদাস আর পাঁচজন ব্রাহ্মণ সন্তানের মত গ্রামে বসে যজমানি পণ্ডিতি বা অন্য কোন বৃত্তি অবলম্বন করার চেষ্টা করেননি। চোদ্দ বছর বয়সের বালক অচেনা ও অজানা শহর কলকাতায় ছুটে গিয়েছেন ইংরাজী বিদ্যাকে আয়ত্ত করে অর্থোপার্জনের পথ খুঁজে বার করতে। দুঃসহ কৃচ্ছ্রতার মধ্য দিয়েই তিনি পুত্রদের মানুষ করেছেন।

বিদ্যাসাগরের মাতামহ ছিলেন রামকান্ত চট্টোপাধ্যায়। সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত, নির্লোভ, সাধক পুরুষ। বিদ্যাসাগরের শ্বশুর শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্যও ছিলেন এক দুর্দান্ত বলবান পুরুষ। লোকে তাঁর নাম শুনলে ভয়ে কাঁপতো।

শিশু বিদ্যাসাগরের মধ্যেই সেই দুরন্ত জেদ দেখা গিয়েছিল। তাঁর জন্মের সময়েই পিতামহ রামজয় রহস্য করে বলেছিলেন—"এ ছেলে এঁড়ের মত বড় একগুঁয়ে হইবে।" বালক বয়সে তাঁর এই একগুঁয়েমি ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছিল। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন তাঁর 'জীবন চরিতে' বলেছেন—"দাদা বাল্যকালে অত্যন্ত একগুঁয়ে ছিলেন। নিজে যাহা ভাল বোধ করিতেন, তাহাই করিতেন, অপরের উপদেশ গ্রাহ্য করিতেন না।"

এই জেদ ও একগুঁয়েমিই তাঁকে নেতার আসনে বসিয়েছে। কিন্তু এই আত্মপ্রাধান্যবোধ অতিরিক্ত হয়ে তাঁকে অসহিষ্ণুও করেছে। শ্রীবিনয় ঘোষ তাঁর "বিদ্যাসাগর ও বাঙালীসমাজ" তৃতীয় খণ্ড গ্রন্থের ৫৮ পৃষ্ঠাতে বলেছেন—"পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সেই ধরনের মানুষের মধ্যে একজন, যাঁরা ঠিক হোক বা ভুল হোক সকল বিষয়ে নিজের মতামতকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন।"

তবু এই জেদ ও অনন্যমুখিনতাই তাঁকে হিন্দুসমাজের অনড় পাহাড় ঠেলে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে।

ধর্ম ও জীবন সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের মনে যে উদারতা ছিল তার কারণ —একদিকে তাঁর বিস্তৃত শাস্ত্রজ্ঞান, হিন্দুদর্শন ও ধর্মশাস্ত্রের গভীরে অনুপ্রবেশ; অন্যদিকে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে সক্রেটিস, প্লেটো থেকে

শুরু করে সমকালীন যুগের কার্লাইল, কোঁতে, রাস্কিন ও বেকন প্রভৃতির চিন্তাধারার সান্নিধ্য। ইতিহাসচেতনা তাঁকে দিয়েছে অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতা। রাজা রামমোহনের জীবনপ্রভাব তাঁকে সর্বমানবের একত্ব-বোধে উদ্দীপিত করেছে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অক্ষয়কুমার দত্তকে কাছাকাছি পেয়েছেন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সভ্য হিসাবে। নানা বর্ণালীর আসা যাওয়া ঘটেছে তাঁর চেতনার আকাশে। কখন যেন অলঙ্ঘ্য নিয়মে তাঁর জীবনে ধর্ম মানুষের ধর্মে এবং ঈশ্বর মানুষের ঈশ্বরে রূপান্তরিত হয়েছে। বন্ধু হিসাবে পেয়েছেন রামগোপাল ঘোষকে —ডিরোজিও-শিষ্য রামগোপাল নির্ভীকচিত্ত ও স্পষ্টবক্তা। পেয়েছেন রেভারেণ্ড্ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে, হিন্দুসমাজ-বিদ্বেষী হলেও যাঁর মন ছিল সহৃদয় ও সংবেদনশীল। সাহচর্য পেয়েছেন ইংরাজ গভর্নর হ্যালিডের, যিনি গুণগ্রাহী ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। আমেরিকান মিশনারী 'ডাল' তাঁর মানব সেবার আদর্শ নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁরই কাছাকাছি। বিদ্যাসাগর কাছাকাছি দেখেছেন কেশবচন্দ্রকে এবং মহাকবি মধুসূদনকে। রামকৃষ্ণদেব-এর মত মুক্তদৃষ্টি পুরুষ এসে সান্নিধ্য দিয়েছেন তাঁকে। এক দিকে অনুসন্ধিৎসা ও শিক্ষানুরাগ যেমন তাঁর দৃষ্টিকে করেছে অনাবিল ; দর্শন ও ইতিহাস পাঠ তাঁর চিন্তায় এনেছে যুক্তিনিষ্ঠা, দিয়েছে বিপ্লব-প্রেরণা ; ইউরোপীয় সাহিত্য তেমনি তাঁর হৃদয়ে মানবতাবাদের রস সিঞ্চন করেছে। সহজাত করুণাবোধের সঙ্গে মিশেছে অন্যায়ের প্রতিরোধেচ্ছা। গভীর বেদনাবোধের সমতল থেকে মাথা তুলেছে এক চিরবিদ্রোহী সৈনিক। আজীবন সংগ্রাম করে করে আত্মবিশ্বাসে সুদৃঢ়, অনমনীয় তাঁর চিত্ত। যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত অশিক্ষা-জনিত সামাজিক অজ্ঞতা, সংস্কার আচ্ছন্নতা, আচারপরায়ণতা, অন্ধ ধর্মনিষ্ঠা ও অনুষ্ঠানসর্বস্বতার অনড় প্রাকারকে ভাসিয়ে দেওয়ার জন্য এমন চরিত্রেরই প্রয়োজন ছিল। বিদ্যাসাগরের অমোঘ ব্যক্তিত্ব বিদ্যাসাগরেরই অর্জিত। তবুও পরিবেশ নিঃসন্দেহে তাঁর নায়কসত্তার রূপসজ্জায় অলক্ষ্য হস্তক্ষেপ করেছে।

ঈশ্বরচন্দ্রর পূর্বপুরুষ হুগলী জেলার লোক। তাঁর প্রপিতামহ ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কার হুগলী জেলার বনমালিপুর গ্রামে বাস করতেন। তিনি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর তৃতীয়পুত্র রামজয় তর্কভূষণই হলেন ঈশ্বরচন্দ্রর পিতামহ।

পারিবারিক অশান্তির জন্য রামজয় দেশত্যাগী হয়েছিলেন; তাঁর স্ত্রী দুর্গা দেবী দু'টি পুত্র ও চার কন্যা নিয়ে পিতৃগৃহ বীরসিংহ গ্রামে এসে ওঠেন। এই বীরসিংহ গ্রামেই ১৮২০ খৃষ্টাব্দের ২৬ সেপ্টেম্বর (বাংলা ১২২৭ সাল, ১২ আশ্বিন মঙ্গলবারে ঈশ্বরচন্দ্রর জন্ম। তাঁর পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় রামজয়ের প্রথম পুত্র।

চরম দারিদ্র্যের জন্য ঠাকুরদাস তাঁর পিতা বা পিতামহর মত পণ্ডিত হয়ে উঠতে পারেননি। চোদ্দ বছর বয়সেই তাঁকে কলকাতা যেতে হয়েছে উপার্জনের চেষ্টায়। চাকরি পাওয়ার আগ্রহে কাজচালানো ইংরাজী শিক্ষা আয়ত্ত করেছেন। কলকাতায় অন্যের আশ্রয়ে থেকে কঠোর পরিশ্রম করেছেন সংসার চালানোর জন্যে।

ঈশ্বরচন্দ্রর প্রথম শিক্ষা শুরু বীরসিংহ গ্রামেই—কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পাঠশালায়। তাঁর নিজের ভাষায়—"আমি গুরুমহাশয়ের প্রিয় শিষ্য ছিলাম। · পাঠশালার সকল ছাত্র অপেক্ষা আমার উপর তাঁহার অধিকতর স্নেহ ছিল।".

১৮২৮ খৃঃর নভেম্বর মাসে ঠাকুরদাস পুত্রকে কলকাতায় নিয়ে এলেন। বড়বাজারে জগদ্দুর্লভ সিংহর বাড়ীতে থেকে স্বরূপচন্দ্র দাসের পাঠশালায় তাঁর শিক্ষা নতুন করে শুরু হলো।

ঈশ্বরচন্দ্রর অনন্যসাধারণ মেধা ও ইংরাজী শিক্ষার প্রতি তাঁর অনুরাগ

এই সময় সুস্পষ্ট হয়ে উঠছিল। তাঁর প্রতিভার পরিচয় পেয়ে শুভানুধ্যায়ীরা পরামর্শ দিলেন ঈশ্বরকে ইংরাজী স্কুলে পড়াতে। হেয়ার্রি স্কুলে পড়ে হিন্দু কলেজে ঢুকতে পারলে ভবিষ্যতে ভাল চাকরি পাওয়ার পথ সুগম হবে। কিন্তু ঠাকুরদাসের ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ। নিজের জীবনের অসহায় ব্যর্থতার কথা তিনি এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারেননি। তিনি মনে মনে আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন যে, সংস্কৃত শিক্ষায় সুপণ্ডিত হয়ে ঈশ্বর দেশে টোল খুলে বসবে। পুত্রের পাণ্ডিত্যে দেশের লোকের কাছে ঠাকুরদাসের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। তাই তিনি ঈশ্বরকে হিন্দু কলেজে পড়ানোর প্রস্তাবে রাজী হতে পারেননি।

কলকাতায় সংস্কৃত কলেজে ঠাকুরদাসের এক আত্মীয় মধুসূদন (বাচস্পতি) তখন অধ্যয়ন করছেন। তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী ঠাকুরদাস পুত্রকে সংস্কৃত কলেজে দেওয়াই সঙ্গত মনে করলেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ১ জুন তারিখে ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করলেন। তাঁর বয়েস তখন নয়।

সংস্কৃত কলেজে মোট বারোবছরে তিনি সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্য, পুরাণ ও দর্শন পাঠ করেন; স্মৃতি, ন্যায় ও জ্যোতিষশাস্ত্র অধিগত করেন। স্বতন্ত্রভাবে বেদান্ত ও ন্যায় পড়েন। তারপর হিন্দু ল' কমিটির পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যই যদিও মুখ্য বিষয় ছিল, সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী ভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও ছিল। ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র যখন, ঈশ্বরচন্দ্র তখনই ইংরাজী ভাষায় কৃতিত্ব-প্রদর্শনের জন্য বিশেষ পারিতোষিক পান। তার মধ্যে গ্রীসের ইতিহাস (History of Greece) বইখানিও পেয়েছিলেন। সংস্কৃত কলেজে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য তিনি মাসিক বৃত্তি ও অন্যান্য অজস্র পুরস্কার পেয়েছিলেন। সংস্কৃত কলেজের শেষ সীমা যেদিন পার হলেন, সেদিনটিও উল্লেখযোগ্য। কলেজের পক্ষ থেকে তাঁকে একটি বিশেষ প্রশংসাপত্র দেওয়া হয়েছিল। এই প্রশংসাপত্রটির তারিখ ছিল ৪ ডিসেম্বর ১৮৪১।

হিন্দু ল' কমিটির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় তাঁর কাছে ত্রিপুরার কোর্টে জজপণ্ডিতের চাকরির প্রস্তাব এলো। বিদ্যাসাগর এই প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। তাঁর প্রথম চাকরি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে—১৮৪১-এর ডিসেম্বরে। কলেজের বাংলা বিভাগের হেডপণ্ডিত হয়ে পঞ্চাশ টাকা

মাইনেতে তিনি ঢুকলেন। তখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটারি জি. টি. মার্শাল। এই মার্শালের প্রভাব বিদ্যাসাগরের জীবনে বিশেষ ফলপ্রসূ হয়েছিল।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে তখন বিদেশী সিভিলিয়ান, যাঁরা এদেশে চাকরি করতে আসতেন—তাঁদেরই ছাত্র হিসাবে যোগ দিতে হত। ইংরাজ সিভিলিয়ান ছাত্রদের সঙ্গে সকল সময়ে কথা বলা এবং তাদের খাতাপত্র পরীক্ষা করার প্রয়োজনে বিদ্যাসাগর ইংরাজী ভাষায় সুদক্ষ হয়ে ওঠার প্রয়োজন অনুভব করেন। কাজেই তিনি ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ইংরাজী পড়াশোনা আরম্ভ করলেন। দুর্গাচরণ-বাবুর পর রাজনারায়ণ বসু ও তারপর নীলমাধব মুখোপাধ্যায় তাঁকে ইংরাজী সাহিত্যে জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করেন। ইতিমধ্যে হিন্দু কলেজের রাজনারায়ণ গুপ্তকে মাসে ১৫৲ টাকা মাইনে দিয়ে নিজের শিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন। শ্রীআনন্দকৃষ্ণ বসু তাঁকে সেক্সপীযার পড়ান।

পরবর্তী যুগে বিদ্যাসাগর তাঁর নিজস্ব গ্রন্থাগারে ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের যে সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন, তার থেকে বোঝা যায় কি বিচিত্র ছিল তাঁর জ্ঞানস্পৃহা। সমগ্র ইউরোপের ইতিহাস গ্রীসের দর্শন ও সাহিত্য, ইংরাজী সাহিত্য তিনি আকণ্ঠ পান করেছিলেন। ইংরাজী ও সংস্কৃত ছাড়া ফারসী ও হিন্দীতেও তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল। এতগুলি ভাষা ও সাহিত্যে অধিকার ছিল বলেই বাংলা সাহিত্যের যথার্থ শিল্পরূপটি তিনি ধরতে পেরেছিলেন।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল পঞ্চাশ টাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদে যোগদান করলেন। মিঃ মার্শালই বিদ্যাসাগরকে এই পদের জন্য মনোনীত করেন। সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক তখন রসময় দত্ত। তাঁর সঙ্গে মতৈক্য না হওয়ায় বিদ্যাসাগর পদত্যাগ করেন। ১৮৪৭ খৃঃর ১৬ই জুলাই তাঁর পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়।

অথচ চাকরি ছেড়ে দেওয়ার মত অবস্থা তখন তাঁর ছিল না। তাঁর কলকাতার বাসাতে তখন বিদ্যাসাগর কয়েকজন দরিদ্র ছাত্রকে পালন করেন। বীরসিংহের বাড়ীর খরচের জন্য মাসে পঞ্চাশ টাকা করে পাঠাতে হয়। পিতা ঠাকুরদাসকে জোর করে অবসর নিতে বাধ্য করেছিলেন; তাঁর সমস্ত দায়ও এখন ঈশ্বরের।

সম্বলের মধ্যে ছিল ভাই দীনবন্ধুর চাকরির আয় মাসে পঞ্চাশ টাকা। ১৮৪৭ থেকে ১৮৪৯ এই দু'বছর তিনি শুধু ঋণের ওপর সব খরচ চালিয়েছেন। এই দু'টো বছর তিনি নষ্ট হতে দেননি। হাতে প্রচুর সময় থাকায় বিদেশী সাহিত্য মন্থনে মগ্ন হলেন। উল্লেখযোগ্য, এই সময়ে ক্যাপ্টেন বাঙ্ক্ নামের এক ভদ্রলোককে তিনি বাংলা হিন্দী ও সংস্কৃত শেখাতেন। বাঙ্ক্ তাঁকে যথোচিত পারিশ্রমিক দিতে চান। কিন্তু বিদ্যাসাগর কিছুই গ্রহণ করেননি।

আবার চাকরি পেলেন ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ—সেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজেই।

কলেজের হেড রাইটার ও ট্রেজারার ছিলেন ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি পদত্যাগ করায় তাঁর জায়গায় মার্শাল সায়েব বিদ্যাসাগরকে নিয়ে এলেন। কিন্তু এক বছর পরেই ১৮৫০ খৃঃর ৯ ডিসেম্বর সংস্কৃত কলেজে ফিরে এলেন। এবার তিনি সাহিত্যের অধ্যাপক, (professor of belles-letters) বেতন মাসে ৯০ টাকা। এডুকেশন কাউন্সিলের সেক্রেটারি ছিলেন ডক্টর মোয়াট। তাঁর আগ্রহেই বিদ্যাসাগর এই পদ গ্রহণ করেন। সাহিত্যের অধ্যাপক হলেও কলেজ পরিচালনার ব্যাপারে তাঁকে অধ্যক্ষের ক্ষমতা দেওয়া হয়।

কলেজে যোগদান করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ওপর আর একটি কাজের ভার পড়লো। সংস্কৃত কলেজকে কিভাবে পুনর্গঠিত করা যায় কিংবা আদৌ কলেজের আর কোন উন্নতি সাধন করা সম্ভব কিনা—এ সম্পর্কে ডক্টর মোয়াট বিদ্যাসাগরের কাছে একটি বিস্তৃত বিবরণী চাইলেন। বস্তুতঃ কলেজের আভ্যন্তরীণ অবস্থা তখন শোচনীয়। কলেজ তুলে দিতে হবে এমন আশঙ্কাও কেউ কেউ করছিলেন। এমন সময়ে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠন সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত রিপোর্টটি প্রস্তুত করলেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর তিনি এই রিপোর্ট দাখিল করলেন। এই রিপোর্টের মধ্যে বিদ্যাসাগরের জ্ঞানও অভিজ্ঞতা, সংস্কারের উপযোগী মনোভাব তাঁর দূরদৃষ্টি ও দুরন্ত সাহসের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। এই রিপোর্টই বিদ্যাসাগরকে প্রতিষ্ঠার সোপানে তুলে দিল।

তাঁর রিপোর্টের উপসংহারে বিদ্যাসাগর লিখেছিলেন—

"In conclusion I beg leave to observe that the changes now

proposed by me in the system of the College are the results of a long and anxious consideration in the subjects. They are extensive but I have endeavoured to select only those which are absolutely necessary for the efficiency of the Institution and which are quite practicable. Should the Council be pleased to adopt these suggestions I have sanguine hopes that the happy and steady effect, if it be under strict supervision, will be that the College will become a seat of pure and profound Sanskrit learning and at the same time a Nursery of improved vernacular literature and of Teachers thoroughly qualified to disseminate that literature amongst the masses of their fellow countrymen."

সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারি রসময় দত্তর পক্ষে তখন আর পদত্যাগ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। এডুকেশন কাউন্সিলের সেক্রেটারি ডক্টর মোয়াট (F. J. Mouat) ৪. ১. ১৮৫১. তারিখের চিঠিতে সেই পদত্যাগ-পত্র গ্রহণ করে ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা অর্থাৎ বিদ্যাসাগরকে কলেজের ভার গ্রহণ করার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর সেক্রেটারির পদটিই বিলুপ্ত হলো ; বিদ্যাসাগর হলেন অধ্যক্ষ। বিদ্যাসাগরকে নিয়োগপত্র দেন বেঙ্গল গভর্নমেণ্ট। নিয়োগপত্রটি এইরূপ ঃ

Dated Fort William,
the 22nd Jan. 1851.

I am directed by the Deputy Governor of Bengal to inform you that his honour has been pleased this day to appoint you to be Principal of the Sanskrit College on a Salary of Rs. 150 per mensum.

I have etc.
Sd. W. Seton Karr
Under-Secretary to the
Govt. of Bengal

কলেজের ভার হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সংস্কৃত কলেজকে পুনর্গঠিত করবার কাজ শুরু করে দিলেন।

'সাহিত্যশ্রেণী' প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর উল্লেখ করেছিলেন—"সাহিত্যশ্রেণীতে পাঠের জন্য চেম্বার্স থেকে জীবনচরিত এবং টেলিমেকস রসেলাস ও মহাভারত থেকে বিবিধ বিষয়ে আকর্ষক অংশগুলিকে অনুবাদ করতে হবে। · ···

"এডুকেশন কাউন্সিল যদি এই বাংলা বইগুলি অনুমোদন করেন তাহলে সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা অতি সহজেই বাংলাভাষায় দক্ষতা অর্জন করতে পারবে।"

শুধু রিপোর্ট লিখেই তিনি থামেননি, ইতিমধ্যে নিজেই অনুবাদ করে কিছু বই বার করেছিলেন। তার মধ্যে 'জীবনচরিত' উল্লেখযোগ্য।

এখানে বলে রাখা দরকার যে, বিদ্যাসাগর অত্যন্ত অভিজ্ঞ ও দূরদর্শী ব্যক্তিত্বর মত ইতিপূর্বেই একটি প্রেস স্থাপন করেছিলেন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ যখন তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে বসে আছেন তখনই তাঁর বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহায়তায় প্রেসটি কেনেন। এই বাবদ তাঁকে ছ'শো টাকা ধার করতে হয়েছিল। এই প্রেস থেকে তাঁর সম্পাদনায় প্রথম বই বার হলো ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য মিঃ মার্শাল একশো বই কিনে নেন। এই একশো বইয়ের দাম ছ'শো টাকায় বিদ্যাসাগর তাঁর ঋণ শোধ করেন। কিছুদিনের মধ্যেই মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সঙ্গে তাঁর মনান্তর ও বিচ্ছেদ ঘটে। ফলে গোটা প্রেসটাই বিদ্যাসাগর কিনে নেন। সংস্কৃত কলেজে পড়ানোর জন্য বিদ্যাসাগর যে বইগুলি লিখলেন, সেগুলি হলো—

১। শিশুশিক্ষা (৪র্থ ভাগ)— ৬ এপ্রিল ১৮৫১
(পরে বোধোদয়)

২। উপক্রমণিকা ব্যাকরণ— ১৬ নভেম্বর ১৮৫১

৩। ঋজু পাঠ ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ— ১৬ নভেম্বর ১৮৫১
৪ মার্চ ১৮৫২
ডিসেম্বর ১৮৫৩

তাঁর রচিত বেতাল পঞ্চবিংশতি (১৮৪৭), বাঙ্গালার ইতিহাস (১৮৪৮) ও জীবনচরিত (১৮৪৯) এই প্রেস থেকেই ছাপা হয়েছিল।

১৮৫৩-তে তিনি স্বগ্রাম বীরসিংহে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কিছুদিনের মধ্যেই এই বিদ্যালয়টির সঙ্গে একটি বালিকা বিভাগ ও সান্ধ্য বিদ্যালয় যুক্ত করেন। এগুলির সকল ব্যয় তিনিই বহন করতেন।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারিতে তাঁর বেতন ৩০০ টাকা করা হয়।

এই সময় বিদ্যাসাগরের আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ প্রাথমিক পর্যায়ে মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন হিসাবে ব্যবহার করার জন্য দাবি উপস্থাপিত করা। অর্থাৎ ইংরাজী শিক্ষাকে যিনি আবশ্যিক করার জন্য বলেছেন, তিনিই বাংলাভাষার প্রসার ও প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলাভাষার ব্যবহারের ওপর সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। বিদ্যাসাগরের অভিমতের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই তদানীন্তন ছোট লাট হ্যালিডে এডুকেশন কাউন্সিলে এ বিষয়ে একটি প্রস্তাব আনেন। হ্যালিডে তার প্রস্তাবের অনুলিপির সঙ্গে বিদ্যাসাগরের অভিমত উদ্ধৃত করেছিলেন। বিদ্যাসাগর যা বলেছিলেন তা হলো :—

"সুবিস্তৃত এবং সুব্যবস্থিত বাংলাশিক্ষা একান্ত বাঞ্ছনীয়। কেননা মাত্র ইহারই সাহায্যে জনসাধারণের শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব।"

এই রিপোর্টে বিদ্যাসাগর আলোচনা করেছিলেন, কিভাবে দেশের পাঠশালাগুলিকে পরিচালনা করতে হবে, কি কি বিষয় পাঠের জন্য নির্বাচিত হবে এবং প্রতিটি পাঠশালার জন্য কি পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হবে। তিনি পাঠশালা পরিচালনার আদর্শ স্থাপন করবার জন্য কতকগুলি মডেল স্কুল স্থাপনের প্রস্তাবও করেন ; এবং এই স্কুলগুলির পরিচালনার দায়িত্বও নিজের হাতে তুলে নিতে চান।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে গভর্নমেণ্ট দেশের বিভিন্ন অংশে ইংরাজী ও বাংলা বিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। এই কাজের তত্ত্বাবধানের ভারও পড়লো বিদ্যাসাগরের ওপর। তিনি হলেন স্পেশাল ইন্‌স্‌পেক্টর অব্ স্কুলস্। মোট বেতন (অধ্যক্ষ হিসাবে ৩০০+ইন্‌স্‌পেক্টর হিসাবে ২০০) পাঁচশো টাকা। বড়লাট প্রথমে পরীক্ষামুলক কাজ চালাবার জন্য চারটি জেলা বেছে নিতে বললেন। এই চারটি জেলা হলো—হুগলী, মেদিনীপুর, নদীয়া ও বর্ধমান।

মডেল স্কুলের যোগ্য শিক্ষক গড়ে তোলার জন্য বিদ্যাসাগর একটি

নর্ম্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবও দিয়েছিলেন। সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগরের তত্ত্বাবধানেই নর্ম্যাল স্কুলও খোলা হলো।

বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের কাজেও তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন জে. ই. ডি. বেথুন। বেথুন ছিলেন এডুকেশন কাউন্সিলের সভাপতি। বিদ্যাসাগরের কর্মোৎসাহ ও স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহ লক্ষ্য করে বেথুন তাঁকেই এই স্কুলের অবৈতনিক সম্পাদক করেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে বেথুনের মৃত্যু হলে গভর্নমেণ্ট এই স্কুলের পরিচালনাভার গ্রহণ করেন। লর্ড ডালহৌসির অনুরোধে বিদ্যাসাগরই স্কুলের সম্পাদক রইলেন। ডালহৌসির পর এলেন ছোটলাট বিডন। স্কুল কমিটির সভাপতি বিডন আর সম্পাদক বিদ্যাসাগর।

ইতিপূর্বেই বলেছি যে ছোটলাট F. J. Halliday শিক্ষা সম্প্রসারণের ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেছিলেন। বিদ্যাসাগরও তার সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন। স্পেশাল ইন্‌স্‌পেক্টর অব্ স্কুলস্ হিসাবে চারটি নির্দিষ্ট জেলায় মডেল স্কুলগুলি খোলার সময় তিনি কতকগুলি বালিকা বিদ্যালয়ও খুলে ফেললেন। ১৮৫৭-র নভেম্বর থেকে ১৮৫৮-র মে, এই ছ'মাসের মধ্যে তিনি মোট ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করলেন।

এই সময় শিক্ষা বিভাগের ব্যবস্থাপনায় কিছু পরিবর্তন ঘটেছিল। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে হ্যালিডের হাতেই এডুকেশন কাউন্সিলের বিলুপ্তি ঘটলো। W. G. Young নামে এক তরুণ ইংরাজ ডিরেক্টর অব্ পাবলিক ইন্‌স্ট্রাক-শন হয়ে এলেন। এই ইয়ং ছিলেন উদ্ধতস্বভাব ও মেজাজী লোক। বিদ্যাসাগরের অপ্রতিহত কর্মক্ষমতাকে তিনি সুনজরে দেখেননি; এবং তাঁর স্থাপিত বালিকা বিদ্যালয়গুলির ব্যয়ভার মঞ্জুর করতেও তিনি রাজী হলেন না। ফলে সমস্ত দায়িত্ব বিদ্যাসাগরের ওপর এসে পড়লো। এই ব্যাপারে ও অন্যান্য কয়েকটি ঘটনায় ক্ষুব্ধ বিদ্যাসাগর হ্যালিডের কাছে তাঁর পদত্যাগপত্র পেশ করেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বরে তিনি সরকারী চাকরি থেকে বিদায় নিলেন। তখন তাঁর বয়েস আটত্রিশ।

ইতিপূর্বেই তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর। ১৮৫৬-র ২৬ জুলাই তারিখে বিধবা-বিবাহ বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ হয়।

আইন পাস হলে বিধবা বিবাহকে সমাজসম্মত করবার জন্য তিনি আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন। এই বিধবা বিবাহ দেওয়ার কাজে তাঁর অনেক টাকা ঋণ হয়ে পড়েছিল। চাকরি ছেড়ে এসে যখন মুক্তজীবনে তিনি দাঁড়ালেন তখন ব্যক্তিগত ব্যয়ও তাঁর প্রচুর। দান ও বদান্যতা এবং বিধবা বিবাহ দেওয়ার ব্যয় ইত্যাদিতে বহু টাকা তাঁকে মাসে মাসে খরচ করতে হতো। কাজেই মাসে পাঁচশো টাকা উপার্জন কমে যাওয়ায় তাঁর বিব্রত হওয়ার কথা। কিন্তু বিদ্যাসাগর যে প্রেস ও প্রকাশনা স্থাপন করেছিলেন (Sanskrit Press Depository) সেটির আয়ও কম ছিল না। সংস্কৃত প্রেস ও ডিপোজিটারির কাজ সুপরিচালনার জন্য বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ করে নিয়ে এলেন। ইতিমধ্যে তাঁর আরও কতকগুলি বই বেরিয়েছিল। সেগুলির নাম : ব্যাকরণ কৌমুদী (১ম-৩য় ভাগ), শকুন্তলা (১৮৫৪), বিধবা বিবাহ, বর্ণ পরিচয়, কথামালা (১৮৫৬) ও চরিতাবলী।

শিক্ষাজগতের সঙ্গে তাঁর যোগ এতই নিবিড় হয়ে উঠেছিল যে চাকরি ছাড়লেও শিক্ষাপ্রসারের তাগিদ তাঁকে ছাড়েনি। ১৮৫৯ খৃঃর ১ এপ্রিল মুর্শিদাবাদের কাঁদিতে তিনি একটি ইংরাজী স্কুল স্থাপন করলেন। এ কাজে তাঁর সহযোগী ছিলেন কাঁদির রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ। এই স্কুলটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করবার জন্য তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না। কিন্তু এর কিছুদিনের মধ্যে তিনি আর একটি মহৎ প্রচেষ্টায় হাত দিলেন। মেট্রোপলিটান ইন্স্টিটিউসন তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

১৮৬১-তে তিনি মেট্রোপলিটান ইন্স্টিটিউসনের ভার নিলেন; ১৮৬৩-তে বেঙ্গল গভর্নমেন্টের আমন্ত্রণে ওয়ার্ড্স্ ইন্স্টিটিউসনের পরিদর্শক। অভিভাবকহীন জমিদার পুত্রকে সরকারী তত্ত্বাবধানে রেখে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার জন্য এই ইন্স্টিটিউসন ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ছিলেন। পরিদর্শক নিযুক্ত হওয়ার পরই বিদ্যাসাগর এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় ত্রুটী দেখতে পান। ১৮৬৪ খৃঃর ৪ এপ্রিল ও ১৮৬৫-র জানুয়ারি ও আগস্টে দুটি স্মারকলিপি তৈরি করেন এবং ইন্স্টিউসনের তত্ত্বাবধায়ক বোর্ড অব্ রেভেনিউয়ের কাছে পাঠান। ওই স্মারকলিপিতে তিনি ইন্স্টিটিউসনের উন্নতির জন্য অনেকগুলি নতুন নিয়মের সুপারিশ করেন।

কিন্তু এই ব্যাপারে রাজেন্দ্রলাল মিত্রর সঙ্গে তার মতবিরোধ ঘটে। সম্ভবতঃ তারপরেই বিদ্যাসাগর পদত্যাগ করেন।

আগেই বলা হয়েছে যে বেথুন স্কুলের (বালিকা-বিদ্যালয়) সঙ্গে বিদ্যাসাগরের নিবিড় যোগ ছিল। তিনিই এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক ছিলেন। স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের জন্য বিদ্যাসাগরের অক্লান্ত প্রয়াসের কথা তখন সর্বত্র স্বীকৃত। ১৮৬৬-তে তাঁর পরিচয় হলো এক মহীয়সী মহিলার সঙ্গে। মিস কার্পেণ্টার ইউরোপ থেকে ছুটে এসেছেন তাঁর ভারতপ্রীতির ঐকান্তিকতায়। স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে তিনি অত্যন্ত উৎসুক। কলকাতায় এসেই তিনি বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। তাঁর অনুরোধে তদানীন্তন শিক্ষা অধিকর্তা মিঃ এ্যাট্‌কিনসন এই যোগাযোগ ঘটিয়ে দেন। মিস কার্পেণ্টার কলকাতার ও কাছাকাছি শহরের বালিকা বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন করতে চান এবং বিদ্যাসাগরকে অনুরোধ করেন তাঁর সঙ্গী হতে। ১৮৬৬ খৃঃ ১৬ ডিসেম্বর মিস কার্পেণ্টার, এ্যাটকিনসন, উড্রো ও বিদ্যাসাগর গেলেন উত্তরপাড়া। ফিরবার সময় হঠাৎ একটি গাড়ী উলটে যাওয়ায় বিদ্যাসাগর ছিট্‌কে পড়ে গেলেন ; বুকে আঘাত লেগে সঙ্গে সঙ্গে অচৈতন্য। তারপর এক মাস শয্যাশায়ী। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের চেষ্টায় সুস্থ হয়ে উঠলেন বটে কিন্তু এই আঘাতেই তাঁর শরীর ভেঙ্গে গেল।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশে খরা দেখা দিল। অনাবৃষ্টির দরুন হুগলী ও মেদিনীপুরের গ্রামাঞ্চলে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া নেমে এল। বিদ্যাসাগর এগিয়ে গেলেন সেবা ও ত্রাণের কাজে। এই সময়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে অসহায় মানুষের সেবায় যেভাবে তিনি কাজ করেছিলেন তাতে সকলের দৃষ্টিই তাঁর ওপরে এসে পড়ে। বর্ধমান ডিভিসনের কমিশনর C. T. Montrisor এই প্রসঙ্গে তাঁকে যে চিঠি লেখেন তার নকল নিচে দেওয়া হলো।

Sir,

I have been instructed by the Secretary to the Govt. of Bengal under order of the 20th instant to express to you the warm acknowledgement of Government for your generous exertions in relieving the poor during the recent scarcity in the Hooghly district.

'সাগরের দয়া' এই সময় প্রবাদ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কোনদিন তাঁর কাছে কেউ প্রার্থী হয়ে এসে ফিরে যায়নি। তিনি ঋণ করে, প্রয়োজন হলে সম্পত্তি বন্ধক দিয়ে এমন কি বিক্রি করেও অপরকে সাহায্য করেছেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত সকৃতজ্ঞ চিত্তে এই মহানুভব হৃদয়ের কথা স্মরণ করে বলেছেন—He had the heart of a Bengali mother.

সারা জীবনের নিরন্ত কর্মব্যস্ততার মধ্য দিয়েও কিন্তু শিল্পী বিদ্যাসাগর হারিয়ে যাননি। তাঁর সাহিত্য রচনা ও সৃষ্টির দায় তিনি বহন করেছেন। ১৮৬০ সালে রচিত 'সীতার বনবাস' বাংলা সাহিত্যে প্রথম শিল্পসুষমান্বিত গদ্য রচনা। তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিও প্রয়োজনবোধেই গড়ে উঠেছিল, কিন্তু সেই সৃষ্টির মধ্যে বাংলা ভাষা এক অফুরন্ত শিল্প-সম্ভাবনার পথ খুঁজে পেল।

সাংবাদিকতার সঙ্গেও নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন বিদ্যাসাগর। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে অক্ষয়কুমার দত্তকে সম্পাদক করে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীতে (Paper Committee) বিদ্যাসাগর সক্রিয় সদস্যরূপেই ছিলেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ হিন্দু পেট্রিয়টের ভার বিদ্যাসাগরের হাতে তুলে দিলে তিনি কৃষ্ণদাস পালকে সম্পাদকের আসনে বসান। 'সাপ্তাহিক সোমপ্রকাশ'ও তাঁরই সৃষ্টি। সোমপ্রকাশের বহু রচনা বিদ্যাসাগরের নিজের। পরবর্তী জীবনে 'বহু-বিবাহবিষয়ক প্রস্তাব'-এ তিনি যে যুক্তিনিষ্ঠা, বিশ্লেষণধর্মিতা অথচ শালীনতার পরিচয় দেন, তা' বাংলা গদ্য সাহিত্যে অভূতপূর্ব।

১৮৬৭ খৃঃ থেকে বিদ্যাসাগরের জীবনে নানা দুর্ভাগ্যের সূচনা দেখা দেয়। তাঁর একমাত্র পুত্র নারায়ণ ও ছোট ভাই ঈশানচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর ক্ষোভের অন্ত ছিল না। তিনি নিজের থাকার জন্য আলাদা ব্যবস্থা করেন, পুত্র ও ভাইদের জন্যও আলাদা ব্যবস্থা। পরের বছরেই সংস্কৃত প্রেস ও প্রেস ডিপোজিটারির স্বত্ব নিয়ে দ্বিতীয় ভাই দীনবন্ধুর সঙ্গে বিরোধ ঘটে। ১৮৬৯ খৃঃর মার্চ মাসে হঠাৎ অগ্নিকাণ্ডে বীরসিংহের বাড়ী ভস্মীভূত হয়। এই বছরেই বীরসিংহের কাছাকাছি ক্ষীরপাই গ্রামে একটি বিধবাবিবাহের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভাইদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ ঘটে। কনিষ্ঠ সহোদর ঈশানচন্দ্রর ব্যবহার তাঁকে এতই ক্ষুব্ধ করে যে, বীরসিংহ তিনি চিরদিনের জন্য ত্যাগ করে কলকাতায় চলে আসেন।

১৮৬৯ খৃঃর আগস্ট মাসে সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটারি তিনি ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তিকে দান করলেন।

১৮৭০ খৃঃর ১১ই আগস্ট তাঁর একমাত্র পুত্র নারায়ণের বিয়ে দিতে হলো। বিয়ে হলো কৃষ্ণনগরের শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিধবা কন্যা ভবসুন্দরীর সঙ্গে। এই বিয়ে তাঁর বাড়ীতে কেউ প্রসন্ন মনে গ্রহণ করেননি ; এমনকি বিদ্যাসাগর নিজেও না। কারণ পুত্রের ব্যবহারে তিনি খুশী ছিলেন না। জননী ভগবতী দেবী সেই মাসেই কাশী যাত্রা করলেন। পরের বছরেই (১৮৭১-এর এপ্রিল) ভগবতী দেবী কাশীতেই মারা গেলেন। মায়ের মৃত্যু বিদ্যাসাগরের জীবনে প্রচণ্ড হয়ে বেজেছিল। এই ব্যথা তিনি বিদীর্ণ বুকে সহ্য করেছিলেন। কিন্তু এক বছরের মধ্যেই তাঁকে আরও বড় আঘাত পেতে হলো। একমাত্র পুত্র নারায়ণের ব্যবহার অশালীন ও দুঃসহ বোধ হওয়ায় তিনি নারায়ণকে বাড়ী থেকে বিতাড়িত করেন। তাঁর জীবনে পুত্রের সঙ্গে মিলন ঘটবার মত অবকাশ আর আসেনি।

পারিবারিক জীবনে এইভাবে বিপর্যয় ঘটতে থাকা সত্ত্বেও একটি দিনের জন্যেও তাঁর আদর্শ থেকে তিনি বিচ্যুত হননি। বিদ্যাসাগর তাঁর জীবনকে শুধু কর্মপ্রবাহের মধ্য দিয়ে চালিত করেছেন। হিন্দু নারীর অসহায় জীবন তাঁকে কাতর করেছিল বলেই তিনি সমাজের বিরুদ্ধে সংগ্রামী সৈনিকের মত অগ্রসর হয়েছিলেন। প্রথমে বিধবাবিবাহ তারপরে বহুবিবাহ রোধ ও বাল্যবিবাহ বন্ধ করা, সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার অর্থাৎ সমাজে হিন্দু নারীর প্রতি যে নির্মম অবিচার এতদিন ধরে করে আসা হয়েছে, তার সবটুকু পাপ তিনি একাই ধুয়ে দিতে চেয়েছিলেন। এবারে আর একটি কাজে হাত দিলেন ; যে পরিকল্পনায় শুধু তাঁর করুণার্দ্র হৃদয়ের পরিচয়ই নয়, সঙ্গে সঙ্গে বিবেকবান ও দূর-প্রসারী চিন্তার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ১৫ জুন "হিন্দু ফ্যামিলি এ্যানুয়িটি ফাণ্ড"-এর প্রতিষ্ঠা এক অভূতপূর্ব ঘটনা।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ তাঁর কাছে নিদারুণ বেদনা বহন করে আনলো। বড় মেয়ে হেমলতার স্বামী গোপালচন্দ্র সমাজপতি হঠাৎ মারা গেলেন। আর দুটি শিশুপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে বিধবা হেমলতা পিতার কাছে এসে আশ্রয় নিলেন। এই দুটি নাতিকে মানুষ করবার ভার বৃদ্ধ বয়সে

বিদ্যাসাগরকেই গ্রহণ করতে হয়েছিল। তাঁর শিক্ষা নিশ্চয়ই ব্যর্থ হয়নি। হেমলতার বড় ছেলে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি পরবর্তীকালে বাংলাদেশে ও সাহিত্যের জগতে অত্যন্ত প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিলেন।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ। বড় মেয়ে বিধবা হয়ে ফিরে আসার পর থেকেই বিদ্যাসাগরের শরীর ভেঙ্গে পড়তে আরম্ভ করে। তাঁর বিচক্ষণ বুদ্ধি তাঁকে একটি উইল তৈরি করার প্রেরণা দিল। এই সময় বহু বিপন্ন ও দুঃস্থ ব্যক্তিকে নিয়মিত মাসোহারা দিতেন তিনি। তাঁর আশঙ্কা ছিল, হঠাৎ মৃত্যু হলে এই আশ্রিত ব্যক্তিরা হয়ত বঞ্চিত হবেন। তাই দেরি না করে উইল তৈরি করলেন, আর মে মাসের ৩০ তারিখে সেই উইলে স্বাক্ষর করলেন।

১৩ জুলাই (১৮৭৫) তারিখে তার তৃতীয়া কন্যা বিনোদিনীর বিয়ে দিলেন ফরিদপুরের শ্রীসূর্যকুমার অধিকারীর সঙ্গে। এই বিয়েতে মধ্যস্থতা করেছিলেন চন্দননগরের শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। "পুত্র-বর্জনের পর বিদ্যাসাগর মহাশয় জামাতা সূর্যকুমারে পুত্রপ্রেম ঢালিয়া দিযাছিলেন।"

[বিহারীলাল পৃঃ ৫৪২]

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে সূর্যকুমারের হাতে মেট্রোপলিটন ইন্‌স্টিটিউসন্ ও কলেজের সমস্ত ভার তুলে দিয়ে তিনি নিজে কিছুটা হালকা হলেন। কিন্তু এই বছরেই এপ্রিল মাসে তাঁর জীবনে আর একটি বেদনাকর ঘটনা ঘটলো ; বাবা ঠাকুরদাস মারা গেলেন।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বাংলার গভর্নর স্যার রিচার্ড টেম্পল তাকে একটি অভিনন্দন পত্র দিলেন। পত্রটির ভাষা :—

"To Pundit Isvara Chandra Vidyasagar in recognition of his earnestness as leader of the widow marriage movement, and position as leader of the more advanced portion of the Indian community." অর্থাৎ

বিধবাবিবাহ আন্দোলনের নায়ক ও ভারতের শিক্ষিত সমাজের অগ্রগণ্য পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কর্মপ্রচেষ্টা ও ঐকান্তিকার স্বীকৃতিস্বরূপ এই অভিনন্দন পত্র প্রদত্ত হলো।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা যেতে পারে যে, ১৮৮০ সালে ভারত সরকার

বিদ্যাসাগরকে সি. আই. ই. উপাধিতে ভূষিত করেন। বিদ্যাসাগর এই ধরনের উপাধি গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন না। শোনা যায় ইতিপূর্বে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছিল, কিন্তু সে প্রস্তাবে তিনি রাজী হননি। যখন সি. আই. ই. উপাধি দেওয়া হলো, তখনও তিনি সেই উপাধি গ্রহণ করতে বড় লাটের দরবারে হাজির হননি। তখনকার দিনে এই প্রত্যাখ্যান দুঃসাহসের কাজ ছিল। বিদ্যাসাগরকে প্রদত্ত এই উপাধিপত্রে লেখা ছিল ঃ

"Grant of the dignity of a Companion of the Order of Indian Empire to Pundit Isvara Chandra Vidyasagar."

১৮৭৭ সালেই বিদ্যাসাগর তাঁর বাদুড়বাগানের নতুন বাড়ীতে প্রবেশ করলেন। এই বছরেই ছোট মেয়ে শরৎকুমারীর বিয়ে দিলেন শ্রীকার্তিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে।

বদান্যতা শিক্ষাবিস্তার ও সমাজ সংস্কারের কাজে তাঁর অনেক টাকা ঋণ হয়েছিল। দেনার তাড়নায় বিদ্যাসাগর তাঁর সংস্কৃত প্রেস বিক্রি করে দেন। প্রেস-ডিপোজিটারি তিনি ইতিপূর্বেই দান করেছিলেন। যাঁকে দান করেছিলেন সেই ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গেও মতের অনৈক্য হওয়ায় ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বিদ্যাসাগর তাঁর নিজের লেখা ও প্রকাশিত বইগুলি ডিপোজিটারি থেকে সরিয়ে নিয়ে এলেন। এই বইগুলি বিক্রির জন্য তিনি সুকিয়া স্ট্রীটে একটি বইয়ের দোকান খোলেন। নাম দেন—দি ক্যালকাটা লাইব্রেরি।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১৩ই আগস্ট তারিখে স্ত্রী দীনময়ী দেবীর মৃত্যু হয়। বিদ্যাসাগরের শরীর তখন জর্জর, মন বিপর্যস্ত। এই সময় কলেজের পরিচালনাসংক্রান্ত ব্যাপারে জামাতা সূর্যকুমার অধিকারীর সঙ্গেও মনান্তর ঘটে। সূর্যকুমার কলেজ পরিত্যাগ করে চলে গেলে বৈদ্যনাথ বসুকে তিনি অধ্যক্ষ মনোনীত করেন বটে কিন্তু ইন্স্টিটিউসন ও কলেজের সর্বময় কর্তৃত্ব দিতে পারেননি। সূর্যকুমারকে যে ভার দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন, সেই ভার গ্রহণের জন্য শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনুরোধ করেন। কিন্তু গুরুদাস এই গুরুদায়িত্ব বহন করতে রাজী না হওয়ায় বিদ্যাসাগর নিজেই এই বয়সে কলেজের তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করেন। তিনি এই সময় প্রায় প্রতিদিনই পালকি করে কলেজে যেতেন।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ১৪ এপ্রিল বীরসিংহ ভগবতী বিদ্যালয়ের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। এই মাস থেকেই তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন।

অসুস্থ অবস্থায় শয্যাশায়ী হয়ে থেকেও বিদ্যাসাগর চিন্তাশূন্য বা কর্মহীন জীবন যাপন করতে চাননি। তাঁর সমস্ত জীবনটা ছিল গতিময়। জীবনের এই শেষমুহূর্তে পৌঁছেও তিনি সহবাস সম্মতি সম্পর্কিত বিলের (Age of Consent) ওপরে তাঁর মতামত বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেন ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯১। বলা বাহুল্য এই বিল আইনে পরিণত করার আগে গভর্নমেণ্ট থেকে তাঁর অভিমত চেয়ে পাঠানো হয়েছিল। এর আগেও আরেকটি ব্যাপারে তিনি যে ভাবে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন, তাতে সকলেই বিস্মিত হয়েছিল। বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, হিন্দু বিধবা একবার যদি বিষয়ের অধিকারিণী হয়, তাহলে পরে সে কলঙ্কিত হলেও তাকে বিষয়ের অধিকার থেকে চ্যুত করা যেতে পারে না। বিদ্যাসাগরের এই মতই আইনে পরিণত হয় কিন্তু এর জন্যও সমাজ তাঁর নিন্দা করেছিল।

পরিশ্রম ও মানসিক অবসাদে শরীরের অবস্থা আরও খারাপ হয়। ডাক্তার শঙ্কিত হয়ে তাঁকে কলকাতা ত্যাগ করে অন্যত্র কোথাও সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে বলেন।

১৮৯০ সালের নভেম্বর মাসে বিদ্যাসাগর তাঁর কন্যা হেমলতাকে নিয়ে চন্দননগরে এলেন। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী তিনি চন্দননগরে নির্জনবাস করে শরীর সারাতে এসেছিলেন। তাঁর সমস্ত অসুস্থতার মুলে ছিলো পেটের গোলমাল। ফলে খাওয়াদাওয়া একেবারেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

অথচ এই অবস্থাতেও তাঁর মানসিক স্বস্তি ছিল না। তিনি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিলেন যে, তাঁর এত যত্নে গড়া কলেজ আবার ডুবে যেতে বসেছে। তিনি জানতেন তাঁর অবর্তমানে কলেজের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে। তাই একটি পরিচালক সমিতির হাতে কলেজের ভার তুলে দেওয়ার ইচ্ছে ছিল তাঁর মনে। কিন্তু সে ইচ্ছে পূর্ণ হয়নি। নতুন একটি উইল এই সময় তিনি রচনা করেছিলেন। কিন্তু সে উইল খুঁজে প্যাওয়া যায়নি। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের মে মাস থেকে তাঁর শরীরের অবস্থার আরও অবনতি ঘটলো। তাঁকে কলকাতায় ফিরিয়ে আনা হলো।

কলকাতার প্রখ্যাত ডাক্তার Birch ও M'Connel তাঁকে দেখে ক্যানসার বলে সন্দেহ করেন। অবশেষে ২৯শে জুলাই তারিখে রাত দু'টো আঠারো মিনিটে বাদুড়বাগানের বাসভবনেই তাঁর মহাজীবনের সমাপ্তি ঘটলো।

"Bengal Under the Lieutenant Governors" গ্রন্থের উপসংহারে C. E. Buckland বিদ্যাসাগর সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, তার থেকে একটি স্তবক শুধু এখানে উদ্ধৃত করছি :

"The life of the eminent Bengali was remarkable on several grounds, and may be studied from different aspects ; (1) as an educational officer, (2) as author and editor of various publications in Bengali, Sanskrit and English, chiefly of an educational character, (3) as a Social reformer, and lastly (4) as a philanthropist.

He combined a fearless independence of character with great gentleness and the simplicity of a child in his dealings with people of all classes..."

সময়ের স্রোত মানুষের সমস্ত কীর্তিকেই ধুয়ে নিয়ে যায়। যার দুরন্ত প্রতিভা একদিন মানুষের মনকে অভিভূত করে রেখেছিল, একযুগ পরেই তাঁকে সাময়িক স্মরণের ওপর নির্ভর করে বাঁচতে হয়। গবেষণার কাজে তাঁকে প্রয়োজন হয়, হয়ত জন্মদিনে শ্রদ্ধা নিবেদন করি। সমাজসংস্কারক বা রাজনীতিকের ভাগ্যে সেটুকু শ্রদ্ধাও জোটে না। প্রসঙ্গক্রমে বিগতযুগের কোন নেতার নাম উঠলে আমরা করুণার সঙ্গে পেছন ফিরে তাকাবার চেষ্টা করি। তার ভুল ক্রটীর উল্লেখ করি এবং গুণগুলির কথাও মনে করি।

সময়ের এই দুরন্ত প্রবহমানতার মাঝখানে তবুও দু'একটি বাতিঘর অটল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তাকে অগ্রাহ্য করে চলে যাওয়ার চেষ্টা কেউ করে না। কারণ শুধু পেছনে ফিরে নয় সামনে তাকিয়েও তাকে দেখতে পাওয়া যায়। অনুভবের অতীত ও ভবিষ্যৎ জুড়েই তার স্থিতি। অর্থাৎ চিরন্তন চিন্তার ছবি তার মুখে; সময়ের পলিমাটি লেগে সে মুখ বিবর্ণ হয়ে যায় না।

বিদ্যাসাগর এমনই একটি নাম। তাঁর জীবন কোন একটি চিন্তায় কোনদিন স্থিত হয়ে থাকেনি, বেগবান কর্মের প্রবাহে এগিয়ে গেছে। তাঁর জীবন এমন একটি চরিত্রের ধারক যা বহুদিন ধরে মানুষকে প্রেরণা দেবে। বহুজনহিতায় দুর্গমপথে একক ঐরাবতের মত এগিয়ে গেছে যে মানুষ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞায় সকল প্রতিরোধকে যে চূর্ণ করেছে সেই অনমনীয় মানুষের চরিত্র। সকল প্রতিকূলতাকে অবহেলা করে একাই যে উত্তুঙ্গ পর্বতশিখরের দিকে এগিয়ে গেছে সেই অদম্যশক্তি মানুষের চরিত্র। রবীন্দ্রনাথ যে চরিত্রের বিশালত্বে অভিভূত হয়ে বলেছিলেন

—"দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রের প্রধান গৌরব তাঁর অজেয় পৌরুষ।"

মহাভারতে কর্ণের চরিত্র আজও আমরা স্মরণ করি কারণ রাজ-গৌরব, সম্পদ বা সুবিধা কোন কিছু তাঁর ছিল না। তবু দুর্ভাগ্যের মধ্য দিয়েই তাঁর পৌরুষের বিকাশ ঘটেছিল। বিদ্যাসাগরের জীবনালোচনায় দেখেছি কি অপরিসীম দারিদ্র্য তাঁর চারিদিকে। সংস্কৃত কলেজের শিক্ষার মধ্য দিয়ে তিনি যখন ভবিষ্যৎ জীবনের রূপরচনায় ব্যস্ত, তখন কি প্রবল প্রতিকূলতা তাঁকে ঘিরে রেখেছে। হিন্দুসমাজের নির্বোধ রক্ষণশীলতা, আর নব্যবঙ্গদলের উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা তাঁর দুইপাশের আবহভূমি। রামমোহনের ব্রাহ্মসমাজ একদিকে আকর্ষণ করেছে মুক্তি-প্রয়াসী হিন্দুমনকে, খৃস্টধর্মের প্রবল আন্দোলন আর একদিকে লোভের হাতছানি দিয়েছে নিপীড়িত সমাজমানসের সামনে।

কিন্তু সব কিছুকে দেখে, সবকিছুর মাঝে থেকে সকল প্রলোভন ও সহজলভ্য প্রতিষ্ঠার পথকে পাশ কাটিয়ে বৃহত্তর জীবনের দিকে এগিয়ে গিয়েছেন বিদ্যাসাগর। রাজা রাধাকান্ত দেবের মত বিশাল ব্যক্তিত্বের সামনে যেমন উদ্ধত মাথা তুলে তিনি দাঁড়িয়েছেন, তেমনি অবজ্ঞায় অস্বীকার করেছেন তদানীন্তন ইংরাজ শাসকবৃন্দের অনুশাসনকে। দুনামের ভয়কে যেমন ভ্রূভঙ্গি করেছেন তেমনি অবহেলা করেছেন সুনামের মোহকে।

সমাজ সংস্কারক, সত্যসাধক, শিক্ষাব্রতী সাহিত্যস্রষ্টা ও মানবপ্রেমিক বিদ্যাসাগর যুগে যুগে অনেকবার জন্মগ্রহণ করবে, কিন্তু যা অনন্য ও অননুকরণীয় তা হলো বিদ্যাসাগরের জীবন। তাঁর সমস্ত কীর্তির চেয়েও তিনি মহত্তর। তাই সময়প্রবাহের দুরন্ত তরঙ্গভঙ্গেও বিদ্যাসাগর আলোকস্তম্ভের মতই আজও দীপ্যমান।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের চাকরি তাঁর জীবনে এক পরম সৌভাগ্যের সূচনা। সেক্রেটারি মার্শাল সাহেবের সাহচর্য সেই সৌভাগ্যকে ত্বরান্বিত করেছিল। মাত্র একুশ বছর বয়সে সেই পরমকাম্য চাকরিটিকে তিনি দু'বার ছুঁড়ে ফেলে দিতে গিয়েছেন, কারণ উগ্র আত্মাভিমানবোধ।

প্রথম ঘটনাটির পেছনে ছিল মার্শাল সাহেবের হস্তক্ষেপ। সে যুগে ইউরোপীয় সিভিলিয়ানদের ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে ভারতীয়

ভাষায় শিক্ষা দিতে হতো। ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন হেডপণ্ডিত। মার্শাল তাঁকে শুধু বলেছিলেন পরীক্ষার ব্যাপারটাকে একটু সহজ করতে। ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর অধিকারে হস্তক্ষেপ করাকে সহ্য করতে রাজী ছিলেন না। অথচ মার্শাল ন্যায়পরায়ণ ও বিবেচক ছিলেন এ কথা বিদ্যাসাগর নিজেই উল্লেখ করেছেন।

দ্বিতীয় ঘটনাটি আরও সাধারণ। ছোট ভাইয়ের বিয়ে; মা লিখেছেন—তোমার আসা চাই। মার্শাল সেই সময়ে ছুটি দিতে রাজী নন। ঈশ্বরচন্দ্র বললেন—তাহলে আমার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করুন। For the sake of my service I cannot suffer my mother to shed tears.

আরও কয়েক বছর পরের কথা। সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের চাকরিতে যোগ দিয়েছেন। তার প্রবর্তিত ব্যবস্থাগুলি সম্পাদক রসময় দত্ত অনুমোদন করলেন না। আহত বাঘের মত লাফিয়ে উঠলেন বিদ্যাসাগর। ১৮৪৭ সালে অর্থাৎ সাতাশ বছর বয়সে তিনি পদত্যাগ করেন। বিস্মিত হয়ে গেলেন সম্পাদক রসময় দত্ত, এমন কি এডুকেশন কাউন্সিলের ডক্টর মোয়াটও। বিদ্যাসাগরকে অনেকেই উদ্‌বিগ্নচিত্তে জিজ্ঞেস করলেন—চাকরি ছেড়ে দিলে; তোমার চলবে কি করে?

সদম্ভে উত্তর দিলেন বিদ্যাসাগর—বাজারে আলু বিক্রি করে চলবে।

ঈশ্বরচন্দ্র জানতেন যে, দারিদ্র্য তাঁর মত মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। ভয়াবহ কৃচ্ছ্র তার পথ মাড়িয়েই তিনি এগিয়ে এসেছেন; সেই কৃচ্ছ্র তাকে পুনর্বার বরণ করে নিতে তাঁর দ্বিধা নেই।

পৌরুষের যে অসংকোচ প্রকাশ তাঁর ব্যবহারে ছিল তার মধ্যে অহেতুক বিনয় বা সৌজন্য ছিল না। ঈশ্বরচন্দ্রের হৃদয়ে সেই সচেতনতা ছিল, যা অন্যের ক্ষেত্রে দাম্ভিকতা এমনকি নির্বুদ্ধিতা বলে বর্ণিত হতে পারে। কিন্তু জীবনের কোন প্রাপ্তির জন্যই তিনি শ্রেয়কে বর্জন করতে রাজী ছিলেন না। কোন ভয়েই তিনি অন্যায়কে মেনে নিতে পারেননি। তাঁর জীবনে সেই শাণিত দীপ্ত পৌরুষের প্রকাশ ঘটেছে যা প্রতিদ্বন্দ্বীকে ম্লান করে দিয়েছে। অনেক সময়ে সেই খড়্গের আঘাতে তাঁর নিজের

জীবনও বিচ্ছিন্ন হয়েছে কিন্তু যোদ্ধার মতই অবহেলায় তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে এগিয়ে গেছেন।

হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ কার সাহেবের মুখের ওপর চটিশুদ্ধ পা উঠিয়ে বসার কাহিনী সকলেরই জানা আছে। সে যুগে এমন দুঃসাহসের কাজ প্রায় অকল্পনীয়। তাঁকে যখন লিখিত কৈফিয়ৎ তলব করা হলো, তখনও তিনি আত্মদোষ স্খালনের কোন চেষ্টা করেননি। বরং নির্ভীকভাবে উত্তর দিয়েছেন ঃ

"I thought that we (natives) were an uncivilised race quite unacquainted with refined manners of receiving a gentleman visitor. I learned the manners of which Mr. Karr complains, from the gentleman himself, a few days ago, when I had an occasion to call on him. My notions of refined manners being thus formed from the conduct of an enlightened, civilised, European, I behaved myself as respectfully towards him, as he had himself done."

এই তেজোদীপ্ততা ও নির্ভীক সত্যবোধের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দৃঢ়তা ও স্বাজাত্যাভিমান। অন্যের অনুকরণ করাও তাঁর কাছে যতটা ঘৃণার্হ ছিল, অন্যের অন্যায়কে সহ্য করে যাওয়াও ততটাই। সরকারী আফিসের বড় চাকরি করতে গিয়ে কিংবা লাট ভবনে যেতে হবে বলে নিজের জাতীয় পোশাককে কোনদিন বিসর্জন দেননি। ধুতিচাদর ও চটির ওপর তাঁর কোন অন্ধপ্রীতি ছিল না, কিন্তু আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্য তাঁর অদম্য স্পৃহা ছিল। বেলভেডিয়ারের রাজভবনেও তিনি এই পোশাকেই গিয়েছেন। গভর্নর হ্যালিডে তাঁকে ইউরোপীয় পোশাক পরতে অনুরোধ করলে তিনি বলেছেন—আপনার সঙ্গে এই আমার শেষ দেখা। আমি ধুতিচাদর-চটি ছাড়তে পারবো না, কাজেই আপনার ভবনে আর আসাও হবে না।

গুণগ্রাহী মানুষ হ্যালিডে; তাই বিদ্যাসাগরের এ মর্যাদাকে তিনি শেষ পর্যন্ত রক্ষা করেছেন।

জাতীয়ভাব ও ঐতিহ্যের অহংকারকে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে এভাবে আর কেউই অগ্রসর হননি। তাঁর দুর্দমনীয় মর্যাদা-

বোধকেই তিনি সঞ্চারিত করে গেছেন সমস্ত জাতির হৃদয়ে। বিদ্যাসাগরের চটি যে কিংবদন্তীর সিংহাসনে আরূঢ় হতে পেরেছিল, তার কারণ এই চটির মর্যাদারক্ষার জন্য তিনি একাই দাঁড়িয়েছিলেন।

১৮৭৪ সালের জানুআরি মাসের আঠাশ তারিখটা স্মরণীয় হয়ে আছে সে ঘটনায়। কাশীর হিন্দিভাষী কবি হরিশ্চন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামের এক যুবককে সঙ্গে নিয়ে বিদ্যাসাগর এলেন এশিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরিতে। সে সময় এশিয়াটিক সোসাইটি ও ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম একই বাড়ীতে অবস্থিত ছিল।

হরিশ্চন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথ যথারীতি সজ্জিত ; তাঁদের পায়েও আধুনিক জুতো (বা shoe)। কিন্তু বিদ্যাসাগরের গায়ে চাদর আর পায়ে তাল-তলার সেই চটি।

হরিশ্চন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথ বিনা বাধায় ভেতরে চলে গেলেন শুধু বাধা পেলেন বিদ্যাসাগর। দারোয়ান আট্‌কালো তাঁকে—চটি খুলে রাখতে হবে।

বাক্যব্যয় না করে বিদ্যাসাগর তখনই ফিরে গেলেন। রাস্তায় তাঁর গাড়ী অপেক্ষা করছিল, তিনি তারই ভেতরে গিয়ে বসে তাঁর সঙ্গীদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

কেমন করে যেন খবর পেলেন সোসাইটির সম্পাদক প্রতাপচন্দ্র ঘোষ। তিনি ছুটে এলেন তখনই। জোড় হাত করে বিদ্যাসাগরকে অনুরোধ জানালেন ভেতরে যেতে। কিন্তু বিদ্যাসাগর অনড়। চটি পায়ে দিয়ে সকলেই যতক্ষণ না ভেতরে প্রবেশের অধিকার পাচ্ছে, ততক্ষণ বিদ্যাসাগর ভেতরে যেতে পারেন না।

ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের ট্রাস্টি পরিষদের সভাপতি ছিলেন তখন এইচ এফ ব্ল্যান্‌ফোর্ড। ৫ই ফেব্রুআরিতে তিনি একটি চিঠি পেলেন বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে। চিঠিটির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি—

"Having had occasion to visit the library of the Asiatic Society of Bengal, I called on the 28th January last. As I wore native shoes, I was not admitted, unless I would leave my shoes behind. I felt so much affronted that I came back without an expostulalion."

"Whilst I was in the compound, I saw that native visitors wearing native shoes, were made not only to uncover their foot but also to carry their shoes with their own hands, though there were some people moving about in the museum rooms with their shoes on."

* * *

"If persons so wearing shoes of the English pattern could be admitted with shoes on, I could not make out why persons of the same status in life and under similar circumstances should not be admitted, simply because they happened to wear native shoes."

Sd/Iswar Chandra Sarma.

এশিয়াটিক সোসাইটি ও ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের শ্বেতাঙ্গ অছিরা বিদ্যাসাগরের প্রতিবাদকে অহেতুক বলে মনে করেছিল। কিন্তু সাধারণ মানুষের মনে এর প্রতিক্রিয়া সেদিন সুদূরপ্রসারী। ইংলিশম্যান, হিন্দু পেট্রিয়ট ইত্যাদি কাগজগুলিও সেদিন মুখর হয়ে উঠেছিল প্রতিবাদে। সে প্রতিবাদ পুরোপুরি গ্রাহ্য না হলেও দেশের মানুষ সেদিন স্বাজাত্য-বোধকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করবার প্রেরণা পেয়েছিল।

এই অদম্য তেজের সঙ্গে যোগ ঘটেছিল সত্যনিষ্ঠার। বিদ্যাসাগর 'যথার্থ ব্রাহ্মণ' ছিলেন ; আপনার পাণ্ডিত্যকে পূর্ণ করে তোলার জন্য তাঁর সাধনার অন্ত ছিল না। সমগ্র শাস্ত্র মন্থন করে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনের বর্ম সংগ্রহ করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর জ্ঞান ভাণ্ডারও হাতড়ে ফিরেছেন ; তাঁর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যকে তিনি পূর্ণ করে তুলেছেন এবং সচেতন হয়েছেন নিজের শক্তির সম্বন্ধে। অথচ এই ব্রহ্মাস্ত্রর প্রয়োগ ছিল পরিমিত। কারণ তাঁর জ্ঞান, বিদ্যা, সামর্থ্য, উচ্চপদ সবকিছুই একটি বিন্দুতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত মিশেছে—সে হলো অপরিমেয় মানবপ্রেম।

তাই হিন্দু সমাজে নারীনির্যাতনের চেহারা যেদিন তাঁর চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সেদিন তিনি আর এক বিদ্যাসাগর। সমগ্র সমাজ

তাঁর বিরুদ্ধে, বন্ধুরা রোষক্ষুব্ধ, আত্মীয়স্বজন সচকিত। কিন্তু বিদ্যাসাগর একাই "বিদ্রোহী সৈনিকের মত তাঁহার চতুর্দিককে অবজ্ঞা করে" লড়ে গেছেন। বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা, শিক্ষায় সঙ্কীর্ণতা প্রত্যেকটি স্তর তিনি সদম্ভ পদক্ষেপে অতিক্রম করেছেন। যারা তাঁকে সমর্থন করেনি তারা বিমুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে থেকেছে।

তাঁর মতামতের প্রকাশও এমনি নির্ভীক ছিল। দেবত্র সম্পত্তি হস্তান্তর করার জন্য মিঃ চ্যাপম্যান যে বিল এনেছিলেন, বিদ্যাসাগর তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন, আবার স্যর জর্জ ক্যাম্পবেলের শিক্ষা সংকোচন নীতিরও তিনিই প্রতিবাদ করেছেন। শিক্ষা অধিকর্তা গর্ডন ইয়ং-এর তাঁবেদারি করার চেয়ে চাকরি ছেড়ে দেওয়া যিনি শ্রেয় মনে করেছিলেন, তিনি কিন্তু সেদিনও তাঁর দায়িত্বকে অস্বীকার করেননি। বরং যে ভার বহনে গভর্ণমেণ্ট ভীত, শিক্ষা প্রসারের সে দায়কে তিনি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। এবং কোন সরকারী সহায়তা না নিয়েই ভারতের প্রথম বেসরকারী কলেজকে সাফল্যের গৌরব চূড়ায় টেনে নিযে গিয়েছেন।

অর্থাৎ অন্তহীন শক্তির সঙ্গে অদম্য জেদকে যিনি যুক্ত করেছেন তিনিই বিদ্যাসাগর। একনিষ্ঠ সত্যবোধের সঙ্গে অপরিসীম করুণা ও মানবতাবোধকে যিনি মেলাতে পেরেছেন এবং সেই সম্মিলিত ধারাকে ভগীরথের মত সাধনার জোরে সাফল্যের ভূমিতে অবতীর্ণ করাতে পেরেছেন, তিনিই বিদ্যাসাগর। স্বধর্মদৃঢ়তা ও সত্যানুধ্যান যার পৌরুষকে বার বার উদ্দীপ্ত করেছে, চতুর্দিককে অবজ্ঞা করে ঐরাবতের মত মানবকল্যাণের সাধনাকে যিনি একাই বহন করে নিয়ে গেছেন, মিথ্যাচার, প্রতিরোধ, অকৃতজ্ঞতা ও প্রতিকূলতার মধ্যে যিনি গৌরীশৃঙ্গের মত জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছেন, তিনিই বিদ্যাসাগর; সময়ের বিক্ষুব্ধ সমুদ্র-তরঙ্গে অটল, আলোকস্তম্ভের মতই দীপ্যমান।

শিক্ষা-বিপ্লবী

দেশ ও সমাজের ভ্রূকুটিকে গ্রাহ্য না করে যা সত্য ও যা বাস্তব তাকেই প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন হয়। কিন্তু যা দীর্ঘকাল ধরে সুপ্রচলিত এবং যা সর্বজনগ্রাহ্য তাকে তীক্ষ্ণ সমালোচনায় পংক্তিচ্যুত করা দুঃসাহসী বিপ্লবীর কাজ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন সেই নির্ভীক ব্যক্তিত্ব যিনি শিক্ষাজগতে বিপ্লব এনে দিয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষা রিপোর্টের (১৬. ১২. ১৮৫০) ভিত্তিতে শিক্ষার আদর্শ ও মান সম্পূর্ণরূপে বদ্‌লে গেছে।

দুঃসাহসী বিপ্লবী বলছি এইজন্য যে, Education Council-এর নির্দেশে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকরূপে ঈশ্বরচন্দ্র শিক্ষা বিষয়ে যে রিপোর্ট প্রস্তুত করেন তার চিন্তাধারা প্রচলিত ধারাকে অতিক্রম করেই শুধু ক্ষান্ত হয়নি, যা অবান্তর বা অপ্রয়োজনীয় বলে বোধ হয়েছে তা নির্দ্বিধায় বর্জন করার অভিমত দিয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র ব্রাহ্মণ্যসমাজের প্রতিভূ এবং শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ হয়েও সংস্কৃত শিক্ষার ভারকে লঘু করার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করেছেন। তখন ন্যায় পড়তে হলে শিক্ষার্থীকে যে অষ্টবিংশতি তত্ত্ব পড়তে হতো তার মধ্যে ছাব্বিশটি তত্ত্বই পুরোহিত ব্রাহ্মণের উপযোগী বলে এবং তার মধ্যে সাধারণের শিক্ষণীয় কিছু নেই বলে ঈশ্বরচন্দ্র লিখলেন—"The study of the 28 Tattwas ought to be discontinued." বলা বাহুল্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতসমাজ তাঁর এই অভিমতকে প্রীতির চোখে দেখেনি। কিন্তু কোন্ কাজ কার প্রীতিজনক এবং কার কাছে অপ্রীতিকর হবে এভেবে কাজ করবার অবসর বা প্রবৃত্তি তাঁর ছিল না। তাঁর শিক্ষার আদর্শ অতিমাত্রায় আধুনিক ও বাস্তবসম্মত ছিল বলেই তিনি নিঃসংশয়ে বললেন—"Under the present system the first 5 years of a

student, of the Sanskrit College is almost lost to useless purposes." আরও বললেন—"Naisadha Charita from the beginning to the end is bombastic and hyperbolical. Its style is neither elegant nor chaste." শুধু সমালোচনা করে কিংবা বর্জনীয় গ্রন্থগুলির অসারতা দেখিয়েই তিনি থামলেন না, সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ দিলেন নতুন ব্যবস্থার। "Great changes are required in this branch of study. For the present, complete treaties on Arithmetic, Algebra and Geometry should be compiled from the best English works on those subjects." অঙ্কশাস্ত্রের ক্লাসে পঠনীয় 'লীলাবতী' ও 'বীজগণিত' (ভাস্করাচার্য রচিত) অসম্পূর্ণ ও অনাধুনিক। "They are in a great measure without any method, and do not contain all that is contained in similar English books." ঈশ্বরচন্দ্র শুধু ইংরাজী নয়, বাংলাভাষাকেও পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ দিলেন। "I beg leave to propose that the study of Bengali books treating on useful and entertaining subjects be introduced….." কিন্তু ইংরাজী পঠন যে অবশ্য কর্তব্য এবং ইংরাজী ভাষায় ইউরোপীয় পণ্ডিতদের রচিত ও আলোচিত গ্রন্থের সঙ্গে সংস্কৃত পুস্তকের বা বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত চিন্তাধারার তুলনামূলক আলোচনা ছাড়া যে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না এ কথা তিনি নির্দ্বিধায় বললেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জানালেন—"The study of English instead of being optional be compulsary".

ঈশ্বরচন্দ্রের এই রিপোর্ট লেখার পরই সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক রসময় দত্ত কলেজের সংস্রব ত্যাগ করলেন এবং ঈশ্বরচন্দ্রই নিযুক্ত হলেন পূর্ণকর্তৃত্বসম্পন্ন অধ্যক্ষ। শিক্ষাসংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে অধ্যক্ষ হিসাবে ঈশ্বরচন্দ্র যে মনোভাবের পরিচয় দিলেন তাও অনুরূপ বলিষ্ঠ ও মানবিক।

সংস্কৃত কলেজে তখন সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল না। সে অধিকার ছিল শুধু ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যের। এই ভেদনীতি অন্যায় ও অযৌক্তিক বলে মনে হলো। ১৮৫১ সালের ২০শে মার্চ তিনি শিক্ষা সংসদে (Education Council) এ বিষয়ে তাঁর রিপোর্ট পেশ করলেন। সেদিন সংস্কৃত কলেজের অন্যান্য অধ্যাপকবৃন্দও এ ব্যাপারে তাঁর বিরোধিতা

করেছিলেন। বাইরেও বহুলোক ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র অবিচল। তিনি বললেন—যদি কায়স্থের সংস্কৃত শিক্ষায় অধিকার না থাকবে তাহলে পণ্ডিত ব্রাহ্মণবৃন্দ কেন কায়স্থ রাজা বা জমিদারদের বাড়ী গিয়ে তাঁদের কাছে অর্থের বিনিময়ে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন? তাঁর অধ্যাপক-বৃন্দকে তিনি ডেকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন যে শূদ্রের শাস্ত্রালোচনায় অধিকার নেই, এই যদি তাঁদের দৃঢ় ধারণা, তবে কেন তাঁরা রাজা রাধাকান্ত দেবকে সংস্কৃত ও শাস্ত্র শিক্ষা দিয়েছেন? সেদিন এই অন্যায় অবিচার রোধে তিনি এতই দৃঢ় হয়ে দাঁড়ালেন যে, সংস্কৃত কলেজ সাধারণের জন্য উন্মুক্ত না হলে তিনি আর অধ্যক্ষ থাকবেন না—বলে ঘোষণা করলেন। অবশ্য শিক্ষা সংসদ তাঁর অভিমতই মেনে নিলেন। দীর্ঘ দিনের এই জাতি-বৈষম্য শিক্ষার প্রাঙ্গণ থেকে দূর করে তবে নিশ্চিন্ত হলেন বিদ্যাসাগর।

বিদ্যাসাগর চরিত্র যে কতদূর সংস্কারমুক্ত ছিল, শুধু সংস্কারমুক্ত নয়, কতখানি মানবমুখী ছিল তার পরিচয় আর একটি ঘটনায় পাওয়া যায়। সেই সময়ে কলিকাতায় হীরা নামে এক বাইজী ছিল যার নাম মোটামুটি অনেকেরই কাছে পরিচিত। হীরা তার পুত্রকে হিন্দু-কলেজে ভর্তি করাতে উদ্যোগী হয়। ছেলেটি একটি বাইজী অর্থাৎ বারনারীর পুত্র কাজেই কলেজের পরিচালক সমিতিতে প্রবল আপত্তি উঠলো। কোন-ভাবে এডুকেশন কাউন্সিলের কাছে পর্যন্ত পৌঁছলো ঘটনাটি। তখন এডুকেশন কাউন্সিলের সভাপতি ছিলেন বেথুন সাহেব। কাউন্সিল নির্দেশ দিল ছেলেটিকে ভর্তি করা হোক।

হিন্দু কলেজে ভর্তি হলো এক বারনারীর পুত্র। কাজেই সারা কলিকাতায় তুমুল আলোড়ন। বিখ্যাত দত্ত পরিবারের রাজেন্দ্র দত্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহায়তায় হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজ স্থাপন করলেন। এবং হিন্দু কলেজকে বর্জন করার জন্য একটি সিদ্ধান্ত রক্ষণশীল হিন্দু ও ব্রাহ্মসমাজের সকলেই গ্রহণ করলেন। বিদ্যাসাগরের কয়েকজন বন্ধু ছুটে এলেন তাঁর কাছে। বললেন—আপনার মত কি?

বিদ্যাসাগর হেসে উত্তর দিলেন—হীরা গণিকা হতে পারে; তার ছেলে ত আর কোন দোষ করেনি। লেখাপড়া শিখতে তার বাধা কি?

এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, শিক্ষা-সংস্কারের ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র যথেচ্ছ ভাবের প্রশ্রয় দেননি। তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান, এবং

সংস্কৃতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। তাঁর ঐতিহ্যচেতনা যে অত্যন্ত প্রবল ছিল এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশের কোন অবকাশ নেই, অথচ মন তাঁর ছিল পুরোপুরি আধুনিক। তাই ইংরাজীভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করে তিনি ইংরাজী গ্রন্থ পাঠ শুরু করেন। শিক্ষা-সংস্কারের কাজ হাতে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌দের গ্রন্থ সংগ্রহ করে তিনি পড়েন। তাঁর পাঠাগারের সংগৃহীত পুস্তকের তালিকা থেকেই এসব জানা যায়। সর্বশেষে তাঁর মানবিক মনোভাব তাঁকে উদার অথচ বলিষ্ঠ নীতি গ্রহণে প্রণোদিত করে।

তিনি যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ, সেই সময় কাশীর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন ব্যালেন্টাইন নামে এক সুপণ্ডিত ভদ্রলোক। কলিকাতার শিক্ষাবিভাগ বিদ্যাসাগরের শিক্ষা-রিপোর্টের ভিত্তিতে পুনর্গঠিত সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শনের জন্য ব্যালেন্টাইনকে আমন্ত্রণ জানালেন। ব্যালেণ্টাইন এই পরিদর্শনের পর শিক্ষাবিভাগের কাছে আর একটি রিপোর্ট দেন। বলা বাহুল্য তাঁর পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের জন্য ব্যালেন্টাইন আরও কিছু পরিবর্তনের সুপারিশ করেছিলেন। যেমন বেদান্ত ও সাংখ্যের সঙ্গে বার্কলের দর্শন পড়াবার পরামর্শ দিলেন ব্যালেন্টাইন। তাঁর নিজের লেখা একখানি বই ছিল। বেন্থাম মিলকে সহজ ও সংক্ষেপ করে বোঝাবার চেষ্টা ছিল এই বইটাতে। এই বইটাও পড়ানো দরকার বলেছিলেন ব্যালেন্টাইন। শিক্ষাবিভাগ এই পরিবর্তনের ফল ভাল হবে কিনা বিচারের প্রয়োজন বোধ করেননি। কারণ ব্যালেন্টাইন নিজে ইংরাজ। কাজেই তাঁর অনুমোদন কার্যকরী করবার জন্য নির্দেশ দিলেন। বিদ্যাসাগর কিন্তু রাজী হলেন না।

বিদ্যাসাগর এই নির্দেশকে শুধু অপমানকর বলে ভাবলেন তাই নয়, তিনি এই পরিবর্তনকে অহেতুক ও ক্ষতিকর বলে মনে করলেন। Education Council-এর সেক্রেটারি ডঃ মোয়টকে তিনি তখনই লিখলেন—"ডক্টর ব্যালেন্টাইনের রিপোর্ট সম্পর্কে শিক্ষাবিভাগের আদেশ স্থিরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলাম। সেই আদেশগুলি হুবহু প্রতিপালন করিতে গেলে পরিষদের অনুমতিক্রমে যে শিক্ষাব্যবস্থা সম্প্রতি সংস্কৃত কলেজে প্রবর্তিত করিয়াছি তাহাতে অযথা হস্তক্ষেপ করা হইবে।.... যে শিক্ষা-ব্যবস্থা আমি অনুমোদন করিতে পারি না তাহাই গ্রহণ করিতে, অথবা

আমার সমপদস্থ অধ্যক্ষের সহিত বিদ্যালয়ের উন্নতির সম্বন্ধে পত্র ব্যবহার করিতে বাধ্য হওয়ার মধ্যে মর্যাদাহানির যে কথা আছে, এমন একটা গুরুতর বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে সেই ব্যক্তিগত কথা আমি মিশাইতে চাহি না। .....আমাকে যদি অন্যের প্রস্তাব গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে আমার কার্য শেষ হইয়াছে।"

শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে সমস্ত গোঁড়ামি ও সঙ্কীর্ণতা দূর করবার জন্য তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তখন শিক্ষাবিস্তার ও স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তনের ক্ষেত্রেও তিনি একক নায়ক। বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের সঙ্গে মহামতি বেথুনের নাম স্মরণীয়। ১৮৪৯ সালে বেথুন 'দি হিন্দু ফিমেল স্কুল' স্থাপন করেন। তখন তাঁর আগ্রহে ঈশ্বরচন্দ্র এই স্কুলের অবৈতনিক সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। এই বিদ্যালয়টিকে গড়ে তোলবার কাজে ঈশ্বরচন্দ্র আত্মনিয়োগ করলেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে, সমাজের ও দেশের মঙ্গলের জন্য স্ত্রীশিক্ষার প্রসার হওয়া দরকার।

রাজা রাধাকান্ত দেবও 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক' নামক প্রবন্ধে বাংলাদেশে নারীশিক্ষার অগ্রগতির কথা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু দেশের মানসিক অবস্থা তখনও অনুকূল বা উদার হযে ওঠেনি। বরং সমাজের বহুলোকই স্ত্রীশিক্ষার ঘোর বিরোধী ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্র ও ইতিহাস ঘেঁটে বহু নজির তুলে ধরলেও সামান্য কিছু সংখ্যক লোক ছাড়া সাধারণভাবে সমাজের সমর্থন পাননি। বেথুনের স্কুলে গাড়ী করে ছাত্রীদের নিয়ে আসা হতো আবার পৌঁছিয়ে দিয়ে আসা হতো। এই গাড়ীর ওপরে ঈশ্বরচন্দ্র সাধারণের অবগতির জন্য যে সংস্কৃত বাণীটি লিখে দিয়েছিলেন সেটি হলো—"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।" বলা বাহুল্য সমাজের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিও এ ব্যাপারে বিদ্যাসাগরকে বিদ্রূপ ও কটূক্তি করেছেন। প্রচলিত সংস্কার, সামাজিক অনুশাসন ও কূপমণ্ডুক মনোভাব ছাড়িয়ে ওঠার জন্য যে উদার শিক্ষার প্রয়োজন সে শিক্ষা সেদিনের মানুষের ছিল না। তাই দীর্ঘদিন শুধু মনের জোর ও কয়েকটিমাত্র বন্ধুর সহায়তার ওপর নির্ভর করে তাঁকে চলতে হয়েছে। বিদ্যাসাগরের অন্যতম জীবনীকার সুবলচন্দ্র মিত্র এই প্রসঙ্গে লিখেছিলেন—"Vidyasagar, therefore, could not secure the cooperation of the Hindus in general. He had to row hard against the tide."

বেথুন মারা যান ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে। বেথুনের মৃত্যুতে ঈশ্বরচন্দ্র দুঃখে অভিভূত হন এবং বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব নিজের কাঁধেই তুলে নেন। ১৮৫৫তে গভর্নমেণ্ট এদেশীয় সাধারণ লোকের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য সচেষ্ট হন। ঈশ্বরচন্দ্রের ওপরেই ভার পড়ে তার কর্মসূচী তৈরি করার। তিনি যে রিপোর্ট দাখিল করেন তারই ভিত্তিতে তাঁকে বিদ্যালয়সমূহের বিশেষ পরিদর্শক নিযুক্ত করা হয়।

হাতে ক্ষমতা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র তদানীন্তন গভর্নর এফ. জে. হ্যালিডের মৌখিক অনুমতি নিয়ে বিভিন্ন জেলায়—মেদিনীপুর, হুগলী বর্ধমান ও নদীয়ায়—বালক এবং বালিকাদের জন্যেও বিদ্যালয় স্থাপন করতে শুরু করে দিলেন। এই সময়ে শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তা হয়ে এলেন ইয়ং নামে এক তরুণ সিভিলিয়ান। ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতিপত্তি দেখে ইয়ং মোটেই খুশী নয়। সে জানিয়ে দিল যে, তার অনুমতি ছাড়া কোন নতুন বিদ্যালয় খোলা চলবে না। কিন্তু কারও হুকুমের অনুবর্তী হয়ে চলা তাঁর কোষ্ঠীতে ছিল না। বিদ্যাসাগর নায়ক হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন। ইয়ং-এর নির্দেশ গ্রাহ্য না করে তিনি আরও কতকগুলি বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। ফলে ইয়ং ব্যয়ভার মঞ্জুর করতে রাজী হলো না। তখন ঈশ্বরচন্দ্র দেখা করলেন গভর্নর হ্যালিডের সঙ্গে। হ্যালিডে নির্দেশ চাইলেন লণ্ডনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে। তাঁরা বিদ্যাসাগরের কাজই অনুমোদন করলেন।

নতুন উৎসাহে তিনি কাজে নামলেন। মাত্র কয়েকমাসের মধ্যে হুগলী, বর্ধমান, নদীয়া ও মেদিনীপুরে পঁয়ত্রিশটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। খুব স্বাভাবিক কারণেই ইয়ং তাঁকে শত্রুর চোখে দেখতে শুরু করেছে। যদিও প্রতিটি বিদ্যালয় স্থাপন করবার আগে ওপরে যথারীতি রিপোর্ট পেশ করেছেন বিদ্যাসাগর, ইয়ং কিন্তু কোন উত্তর না দিয়ে কোন মন্তব্য পর্যন্ত না করে নিঃশব্দ থেকেছে। এদিকে গোপনে তাঁর রিপোর্ট গেছে লণ্ডনে। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে তাঁদের মত বদলে গেল। বছরের শেষে গভর্নর জেনারেল জানালেন যে এইভাবে অর্থব্যয় করবার ইচ্ছা গভর্নমেণ্টের নেই। বলা বাহুল্য বিদ্যাসাগর যে সকল বিল দাখিল করেছিলেন দীর্ঘদিন ধরে সেগুলি ইয়ংয়ের ফাইলে আট্‌কে ছিল। এখন তিনি সমস্ত খরচ নামঞ্জুর করলেন। অর্থাৎ

এক বছর ধরে পঁয়ত্রিশটি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনের সমস্ত টাকাটা আট্‌কে গেল।

লণ্ডনের এই মনোভাব পরিবর্তনের মূলে অবশ্য অন্য কারণও ছিল। সিপাই বিদ্রোহের ফলে বহু টাকা বেরিয়ে গেছে; সরকারী মনোভাবও এদেশীয়দের প্রতি বিরূপ। কিন্তু বিদ্যাসাগর এই ব্যাপারে অগ্রণী হতে সাহস করেছিলেন কারণ এক বছর পূর্বে সরকারী মনোভাব তাঁর অনুকূল ছিল। এখন সমস্ত দায় এসে পড়লো তাঁর ঘাড়ে।

বিদ্যাসাগর চরিত্রের একটি মহৎ গুণ এই যে, তিনি হতাশ হতে জানতেন না। কোন কাজে এগিয়ে গেলে, পেছিয়ে আসাও তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল। তিনি এই বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকদের সমস্ত বেতন মিটিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত করলেন ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়। অর্থাৎ ঋণ গ্রহণ করে সেই টাকায় শোধ করবেন এই দায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাসাগর আরও একটি সিদ্ধান্ত নিলেন। যে শিক্ষাবিভাগকে তিনি গড়ে তুলেছিলেন সেই শিক্ষাবিভাগ থেকেই সরে আসা বাঞ্ছনীয় মনে করলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, এই সরকারী চাকরির বাঁধনের মধ্যে পড়ে থেকে মহৎ কিছু করা আর সম্ভব নয়। তাই চাকরি ত্যাগ করে স্বাধীনভাবে সমাজের ও দেশের কাজে হাত দিতে চাইলেন।

২৯.৮.৫৭ তারিখে ইয়ংয়ের কাছে একটি চিঠি লিখে বিদ্যাসাগর চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। এই প্রসঙ্গে গর্ডন ইয়ংয়ের সঙ্গে তাঁর কয়েকখানি পত্র বিনিময় হয়। একটিতে বিদ্যাসাগর সুস্পষ্ট ভাষাতেই বললেন—বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতিতে আমি আর শিক্ষার প্রসারের কোন সম্ভাবনা আছে বলে মনে করি না। শিক্ষার ব্যাপারে যে উদার ও সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাবের প্রয়োজন, বর্তমান কর্তৃপক্ষের তা নেই।

গভর্নর হ্যালিডে বিদ্যাসাগরের গুণগ্রাহী ছিলেন। তিনি চান্‌নি যে, বিদ্যাসাগর চাকরি থেকে সরে যান। বিদ্যাসাগর হ্যালিডেকে একটি চিঠিতে লিখলেন—

"...I had often represented to you that I frequently felt it disagreeable and inconvenient to serve Govt. under existing circumstances and that I considered the present system upon which the department of Vernacular Education was conducted,

was a mere waste of money. You are aware that I often met with discouragement in my way. I saw besides no prospects of advancement ‥ ‥"

হ্যালিডে চেষ্টা করেছিলেন যাতে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করেন বিদ্যাসাগর। বন্ধুরাও বাধা দিয়েছিলেন। সে যুগে তাঁর বেতনের পরিমাণ (মাসে পাঁচশো টাকা) উপেক্ষা করবার মত নিশ্চয় ছিল না। তাছাড়া বিধবা-বিবাহ প্রবর্তনের চেষ্টায় বিদ্যাসাগরের প্রচুর ঋণ। বহু পরিবার ও ব্যক্তি তাঁর মুখাপেক্ষী। তবু সংকল্পে অটল বিদ্যাসাগর। ১৮৫৮ খৃঃ এর নভেম্বরে চাকরি ছেড়ে দিলেন। তখন তাঁর বয়স আটত্রিশ বছর।

এর পর ও হ্যালিডে তাঁকে বলেছিলেন—আপনি গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে মামলা করুন। আমি সাক্ষী দেব যে, স্কুল খোলার ব্যাপারে গভর্নমেণ্টের মৌন সম্মতি ছিল। আপনি আমাকে জড়িয়েই মামলা করুন।

কিন্তু মামলা করতেও তাঁর আত্মসম্মানে বাধে। কোন ভার গ্রহণে তিনি অপরাগ নন। শিক্ষা দপ্তর থেকে সরে এলেও শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে সরে গেলেন না। তিনি বিভিন্ন স্থানে অনেকগুলি বিদ্যালয় পরিচালনা করতে লাগলেন। তাঁকে এই কাজে যাঁরা বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন, তাঁদের মধ্যে সিসিল বিডন এর নাম উল্লেখযোগ্য।

এর মাত্র এক বছর পরে অর্থাৎ ১৮৫৯ সালে বিদ্যাসাগর আর একটি বিরাট কীর্তি গড়ে তোলবার চেষ্টায় রত হলেন। সে প্রচেষ্টা মেট্রোপলিটান কলেজের প্রতিষ্ঠা। সরকারী সহায়তা থেকে সম্পূর্ণ দূরে থেকে প্রায় একক প্রচেষ্টায় তখনকার দিনে একটি বেসরকারী প্রথম শ্রেণীর কলেজ গড়ে তোলা প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। কিন্তু বিদ্যাসাগর ছিলেন এমন একটি মানুষ যিনি সমাজ ও দেশের প্রয়োজনে সকল বাধাই অতিক্রম করেছেন। যিনি আপন আত্মসম্মান রক্ষার জন্য জীবন বিসর্জন দিতে রাজী ছিলেন, যিনি মর্যাদা রক্ষার জন্য চাকরি ছেড়ে দিয়ে কৃচ্ছ্রতার জীবন বরণ করেন, তাঁর পক্ষেই বোধহয় সম্ভব ছিল আপন অজেয় পৌরুষের বলে এমন একটি কীর্তিস্তম্ভকে সুদৃঢ় করে গড়ে তোলা।

মেট্রোপলিটান কলেজ

বাংলাদেশে শিক্ষাসংস্কারের ইতিহাসে রাজা রামমোহন রায় ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—দুজনের নামই সমান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। রামমোহন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য-শিক্ষায় সমান পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। তিনিই প্রথম চেষ্টা করলেন ইংরাজী শিক্ষার প্রসারের জন্য। তিনি অনুভব করেছিলেন যে, শিক্ষায় আধুনিক মনোভাব সৃষ্টির প্রয়োজন। দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত ও পাশ্চাত্য জগতের ইতিহাস ইংরাজীর মাধ্যমেই আমাদের জানতে হবে। ১৮১১ সালে লর্ড মিন্টোর শিক্ষাসংক্রান্ত রিপোর্ট তৈরি হলো যখন, তখন রামমোহন তাঁর পূর্ণ কর্মোদ্যমে বিরাজিত। ১৮১৫ সালে কেরী ও মার্সম্যানের প্রচেষ্টায় শ্রীরামপুর কলেজের প্রতিষ্ঠা; আর ১৮১৭ সালে রামমোহনের চেষ্টায় গরাণহাটায় হিন্দু কলেজের সূচনা। হিন্দু কলেজই বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। কিন্তু এ কলেজের পরিচালনায় এমন কি অধ্যাপকমণ্ডলীতে ইংরাজদেরই প্রাধান্য ছিল। হিন্দু কলেজ ও কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক ডিরোজিওর শিক্ষায় যে নব্যবঙ্গের দল গড়ে উঠছিল, তারা স্বদেশ ও স্বধর্মকে ঘৃণা করতে শিখেছিল। এই নব্যবঙ্গের দল সোচ্চারে ঘোষণা করেছিল—"If there is anything that we hate from the bottom of our heart, it is Hinduism."

এই পরিবেশে ১৮২০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগরের জন্ম বিশেষ অর্থসূচক। তার মাত্র তিন বছর পরে অর্থাৎ ১৮২৩ সালে রামমোহন শিক্ষার উন্নতি সম্পর্কে একটি চিঠি লিখলেন লর্ড আমহার্স্ট কে। ১৮২৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হলো সংস্কৃত কলেজ। আর ১৮২৯ সালে সেই কলেজেই এসে ভর্তি

হলেন বিদ্যাসাগর। ১৮৩৩-এ রামমোহন যখন লোকান্তরিত হলেন, তখনও বিদ্যাসাগর ছাত্র।

শিক্ষাপদ্ধতি কি হবে তাই নিয়ে তখনও অনেক বিতর্ক জমে রয়েছে। প্রাচ্য সংস্কৃত শিক্ষা ও ইংরাজী শিক্ষার মধ্যে পুঞ্জীভূত বিরোধ। মেকলের মত ইংরাজীনবিসেরা বলেন—"A single shelf of a good Europeon library was worth the whole native literature of India and Arabia." একদিকে যেমন অনুকরণকারী নব্যবঙ্গের (Young Bengal) দল অন্যদিকে তেমনি আচারনিষ্ঠ, রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ। এরই মধ্যে দিয়ে ধীরগতিতে সূর্যের মত বিকাশ ঘটছিলো ঈশ্বরচন্দ্রের। সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকরূপে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে তিনি যে শিক্ষাসংক্রান্ত রিপোর্ট তৈরি করলেন তা যেমন বৈপ্লবিক তেমনি যুগান্তকারী।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হলেন বিদ্যাসাগর তাঁর লেখা রিপোর্টের ভিত্তিতে। তাঁর প্রথম প্রয়াস শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে সকল সঙ্কীর্ণতা দূর করা। শিক্ষাবিভাগের স্পেশাল অফিসাররূপে একদিকে তিনি যেমন বালকদের জন্য বিভিন্ন জেলায় বিদ্যালয় স্থাপন করে চললেন, অন্যদিকে তেমনি বালিকাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের চেস্টারও তিনি হলেন অক্লান্তকর্মী। বেথুন সাহেবের সহকর্মী হয়ে বিদ্যাসাগর স্ত্রীশিক্ষার জন্যও আত্মনিয়োগ করলেন। কিন্তু সরকারী চাকরিতে থাকা তাঁর সম্ভব হলো না। শিক্ষা অধিকর্তা গর্ডন ইয়ং-এর সঙ্গে ঝগড়া করে চাকরি ছেড়ে বেরিয়ে এলেন যখন, তখন তিনি নিঃস্বপ্রায়। সংস্কৃতপ্রেস ও প্রকাশিত বইগুলির বিক্রির উপর নির্ভর করে সেদিন তিনি যে গুরুভার ঘাড়ে তুলে নিয়েছিলেন সে শুধু বিদ্যাসাগরের পক্ষেই সম্ভব।

বিদ্যাসাগর সরকারী চাকরি থেকে বিদায় নিলেন ১৮৫৮ সালের অক্টোবর মাসে। ১৮৫৯ সালে শঙ্কর ঘোষ লেনে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, যার নাম ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুল; উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন বৈষ্ণবচরণ আঢ্য, ঠাকুরদাস চক্রবর্তী, মাধবচন্দ্র ধাড়া, পতিতপাবন সেন, গঙ্গাচরণ সেন এবং যাদবচন্দ্র পালিত।

কয়েকমাসের মধ্যেই উদ্যোক্তারা ঈশ্বরচন্দ্রের মত পণ্ডিত ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে স্কুলের পরিচালনায় আনার জন্য সচেষ্ট হলেন। ফলে

বিদ্যাসাগর ও তাঁর বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুলের সঙ্গে যুক্ত হলেন।

১৮৬১ সালের কথা। উদ্যোক্তাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। ফলে কয়েকজন কিছু টাকাকড়ি সমেত সরে গেলেন। পতিতপাবন সেন, গঙ্গাচরণ সেন প্রমুখেরা ঈশ্বরচন্দ্রের হাতেই কলেজের ভার সম্পূর্ণরূপে তুলে দিলেন।

১৮৬১ সালেই স্কুল পরিচালনার জন্য প্রথম কার্য্যকরী কমিটি গঠিত হলো এবং বিদ্যালয় সংক্রান্ত নিযমাবলীও তৈরি করা হলো। কমিটিতে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঃ

রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ—সভাপতি

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—সম্পাদক এবং

রমানাথ ঠাকুর, হীবালাল শীল, রামগোপাল ঘোষ, হরচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি।

নিযমাবলীতে ঘোষণা করা হলো—"The object of the Institution is to give an efficient education to Hindu youths in the English as well as the Bengali language and literature"

১৮৬৪ সালে স্কুলের নাম বদলিযে মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউসন করা হলো। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালযে আবেদন করা হলো—বি. এ. ক্লাস পর্যন্ত পডানোর অনুমতির জন্য। বিশ্ববিদ্যালয সে আবেদন নামঞ্জুর করেছিল।

এই সমযে কলাবিভাগে উচ্চশিক্ষা দেওযার উদ্দেশ্যে যে শিক্ষকদের নিযোগ কবা হযেছিল তাঁদের মধ্যে ছিলেন আনন্দকৃষ্ণ বসু, হেরম্বলাল গোস্বামী ও মহেশচন্দ্র চ্যাটার্জী। এঁরা প্রত্যেকেই বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও হরচন্দ্র ঘোষ মারা যাওযায ইনস্টিটিউসনের পুরো দায়িত্বই বিদ্যাসাগরের ওপর এসে পডলো। তখন প্রত্যেকটি ছাত্রের মাসিক বেতন ছিল তিন টাকা। কিন্তু ছাত্রসংখ্যা অত্যন্ত কম। তবু মেট্রোপলিটান আশার অতিরিক্ত ভাল ফল দেখাতে লাগলো।

১৮৭২ সালে বিদ্যাসাগর নতুন করে পরিচালনা কমিটি গঠন করলেন। এবার কমিটিতে রইলেন—ঈশ্বরচন্দ্র নিজে, দ্বারকানাথ ঠাকুর ও কৃষ্ণদাস পাল। কমিটি তৈরি করেই বিদ্যাসাগর আবার দরখাস্ত দিলেন এফ. এ.

ক্লাস পর্যন্ত অনুমোদন চেয়ে। ১৮৭২ সালের ২৫শে জানুআরি এই দরখাস্ত দেওয়া হলো ইউনিভারসিটির তদানীন্তন রেজিস্ট্রার জে. সাটক্লিফ-এর কাছে। শুধু দরখাস্ত দিয়েই বসে রইলেন না বিদ্যাসাগর। সিণ্ডিকেটের সভ্য E. C. Bayley-র কাছেও তিনি চিঠি লিখলেন।

Bayley সাহেবের কাছে যে চিঠি লিখলেন বিদ্যাসাগর, তাতে তিনি বললেন যে,

১) বেছে নিতে পারলে নেটিভ শিক্ষকদের মধ্যেও উপযুক্ত লোক পাওয়া যায়—যারা উচ্চশিক্ষা দিতে পারে।

২) ইংরাজী শিক্ষার জন্য প্রয়োজন হলে ইংরাজ শিক্ষক নিযুক্ত করতে তাঁরা কুণ্ঠিত হবেন না।

৩) বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য অর্থের অভাব ঘটলে তাঁরাই সে অর্থ দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন এবং

চতুর্থতঃ যে যুক্তি দিলেন, তা হলো ঃ—

"The high rate of schooling charged at the Presidency College is prohibitory to many middle class youths, while their parents, being opposed to their boys being sent to Missionary College, they are obliged to give up academic education after matriculation. This Institution would be a great boon to them."

আবেদন মঞ্জুর হলো। মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউসন এফ. এ. (অর্থাৎ ফার্স্ট আর্টস) পর্যন্ত পড়ানোর স্বীকৃতিলাভ করলো এবং সেকেণ্ড গ্রেড কলেজ রূপে গণ্য হলো।

তখনও কেউ বিশ্বাস করতে রাজী ছিল না যে, নেটিভ কলেজে ইংরাজী শিক্ষা সম্ভব। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম এফ. এ. পরীক্ষায় ছাত্র পাঠানো হলো। আর প্রথমবারেই ফল অভাবিত। যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে প্রথম—বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান লাভ করায় সকলে বিস্মিত।

এই সময়ে কলেজে যাঁরা অধ্যাপনা করছিলেন, তাঁদের নাম—

১) শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—ইংরাজী

২) শ্রীচন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—ইতিহাস ও দর্শন

৩) শ্রীপ্রসন্নকুমার লাহিড়ী —ইংরাজী
৪) শ্রীবৈদ্যনাথ বসু —গণিত
৫) শ্রীনবীনচন্দ্র বিদ্যারত্ন —সংস্কৃত

কলেজের সমস্ত ব্যয়ভার তখন বিদ্যাসাগরের কাঁধে। চেয়ার বেঞ্চি অবধি তাঁকে নিজের টাকা দিয়ে কিনে দিতে হয়েছে। তাছাড়াও বছরে তিন হাজার টাকা হিসেবে সাহায্য দিয়েছেন নিজের কাছ থেকে।

ইনস্টিটিউসনকে তিনটি বিভাগে ভাগ করা হয়েছিল।

প্রথম : কলেজ
দ্বিতীয় : স্কুল
তৃতীয় : বাংলা শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র বিভাগ।

ছাত্রদের কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য ফি দিতে হতো পাঁচ টাকা; মাসিক বেতন ছিল তিন টাকা। আইনের ক্লাসে বেতন ছিল :

প্রথম বছরে—ত্রিশ টাকা
দ্বিতীয় বছরে—ছত্রিশ টাকা
তৃতীয় বছরে—বিয়াল্লিশ টাকা

দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের ক্ষেত্রে বেতনের প্রশ্ন ছিল না। অনেক দরিদ্র ছাত্রকে বাসা খরচও দেওয়া হতো; এমন কি বিদ্যাসাগর তাদের বই পর্যন্ত কিনে দিতেন। বিদ্যালয় বা কলেজে কোন শিক্ষক কোন বালককে কটুবাক্য বলেছেন বা কোন রকম শারীরিক শাস্তি দিয়েছেন, এমন প্রমাণ পেলে বিদ্যাসাগর সেই শিক্ষককে পদচ্যুত করতেন।* এবং কোন বালকের আচরণ দুষ্ট বলে মনে হলে তাকেও বহিষ্কৃত করতেন।

এই সময়ে কলেজের নিজস্ব কোন ভবন ছিল না। বিদ্যাসাগর কলেজ তুলে এনেছেন নিজের বাস ভবনে—৬৩ নম্বর আমহার্স্ট স্ট্রীটে, কারণ শঙ্কর ঘোষ লেনে জায়গা নেই। মনে তার দুরন্ত উদ্‌বেগ। মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউসনকে আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। মেট্রোপলিটানই বাংলাদেশে (ভারতবর্ষেও) প্রথম ব্যক্তিগত উদ্যোগে গড়ে-তোলা কলেজ। তা ছাড়া বি. এ. ক্লাশ পর্যন্ত পড়ানোর অনুমতিও পেতে হবে।

* শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত জীবনচরিত—পৃঃ ১৩২

পরিশ্রম ও মানসিক পীড়নে বিদ্যাসাগর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কলেজ পরিচালনার জন্য তিনি হেয়ার স্কুলের তরুণ শিক্ষক সূর্যকুমার অধিকারীকে মনোনীত করলেন। 'বিদ্যাসাগর জীবনচরিত' এর রচয়িতা শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন—"সূর্য্যবাবুকে ঐ পদ পরিত্যাগ করাইয়া মেট্রোপলিটানে সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত করাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। ঐ বিষয়ে সূর্য্যবাবু প্রথমতঃ অসম্মতি প্রকাশ করেন। অনেক বাদানুবাদের পর দাদার আগ্রহাতিশয় দেখিয়া ও অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হন"।

সূর্যবাবু কলেজের উন্নতির জন্য প্রচুর পরিশ্রম করেন। তাঁর কাজে সন্তুষ্ট হয়ে বিদ্যাসাগর তাঁর হাতে কলেজের পুরো দায়িত্ব ছেড়ে দেন। সূর্যবাবু কলেজের সম্পাদক ও অধ্যক্ষ হিসাবে নিযুক্ত হন।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে বি. এ. ক্লাস পর্যন্ত পড়ানোর অনুমোদন পাওয়া গেল। ১৮৮১-তে অর্থাৎ প্রথম বছরেই ষোলজন ছাত্র বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলো। এই সময় অধ্যাপকমণ্ডলীতে ছিলেন—

সূর্যকুমার অধিকারী—অধ্যক্ষ
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রসন্নকুমার লাহিড়ী
বৈদ্যনাথ বসু
ক্ষুদিরাম বসু
চণ্ডিদাস ঘোষ ও
নবীনচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

১৮৮৪-তে ল' ক্লাস খোলা হলো, ১৮৮৫-তে বি. এ. অনার্স। মেট্রোপলিটান কলেজ ফার্স্ট গ্রেড্ কলেজ হিসাবে পরিগণিত হলো। শিক্ষা-অধিকর্তা তাঁর রিপোর্টে (১৮৮২-৮৩) লিখলেন—

"In the B. A. Examination the Govt. Colleges passed 45·8 per cent, the aided Colleges 40 per cent, while the un-aided Metropolitan Institution 45·8 per cent. The success of the Institution reflects great credit on its manager and the teaching staff."

১৮৮৪ সালে কলেজের ছাত্রসংখ্যা ছিল মোট ৫০০ জন। ১৮৮৮-তে

এই সংখ্যা বেড়ে হলো ৮৩৭ জন। প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রসংখ্যা তখন ৩৩৩ জন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রের সংখ্যা ঃ

	এফ. এ.	বি. এ.	এম. এ.
১৮৮০	৪৮	—	—
১৮৮১	৩১	১৬	—
১৮৮২	২৭	৭	—
১৮৮৩	৬২	২৪	—
১৮৮৪	১৮	৩৪	—
১৮৮৫	৪৩	৫৫	৪
১৮৮৬	৯৬	৭৯	৪
১৮৮৭	৮৩	৭৮	২
১৮৮৮	৭০	৬৫	৭

১৮৮৪ সালে শিক্ষা অধিকর্তার রিপোর্টে লেখা হলো—"The only aided College Metropolitan Institution passed 46 per cent against 44 per cent in 1883 and 17% in 1882."

১৮৮৭-৮৮ সালের রিপোর্টে—"The Metropolitan College passed the largest number of candidates."

অন্যত্র—"The un-aided Metropolitan Institution of Calcutta is by far the largest of the Colleges, while it also shows the largest increase."

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ফলাফলের ওপর মন্তব্য করা হলো—

"The advance of the un-aided colleges is very marked. The ten scholarships of the first grade for male students were awarded as usual, to the first ten candidates on the list, and of these, the Metropolitan Institution secured three, thus for the first time *beating the Presidency College*"

মেট্রোপলিটন কলেজের এই কৃতিত্বের জন্য এবং সূর্যকুমার অধিকারীর বিদ্যাবত্তা ও সাহিত্যচিন্তার স্বীকৃতি হিসাবে গভর্নর জেনারেলের বিশেষ আদেশ বলে তাঁকে ১৮৮৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো

মনোনীত করা হয়; এবং তিনি ফ্যাকালটি অফ আর্টস্ হন। এই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন—H. Reynolds.

ভারতবর্ষের বৃহত্তম কলেজ, অথচ তখনও তার নিজস্ব ভবন ছিল না। অধ্যক্ষ সূর্যবাবুর চেষ্টায় শঙ্কর ঘোষ লেনে প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা দামে কলেজের জন্য জমি কেনা হয়। (শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন—বিদ্যাসাগর জীবন চরিত)।

"The magnificent building of the Metropolitan Institution was erected at the cost of a lakh and half of rupees.—" C. E. Buckland.

বলা বাহুল্য পুরো টাকাটাই বিদ্যাসাগর ঋণ করে সংগ্রহ করেছিলেন।

" .....The establishment of the Metropolitan Institution in Calcutta and its successful working under his management, as a first grade college, are well-known to the educational history of Bengal."

(C. E. Buckland—Bengal under the Lieutenant Governors).

শঙ্কর ঘোষ লেনে বিদ্যাসাগর কলেজ ও মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউসনের বর্তমান ভবনটি অধ্যক্ষ সূর্যকুমার অধিকারীর পরিশ্রম ও তত্ত্বাবধানে নির্মিত। ১৮৮৬-তে কলেজভবন নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়, এবং ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের জানুআরি মাসে নতুন ভবনে কলেজ উঠে আসে।

কলেজের উন্নয়ন ও সাফল্যের জন্য সূর্যকুমারের যেমন পরিশ্রমের সীমা ছিল না ইনস্টিটিউসনের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য তেমনি তাঁর অকুণ্ঠ প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। তাঁর চেষ্টাতেই ১৮৮৫ ও '৮৭ খৃষ্টাব্দে বউবাজার ও বড়বাজারে স্কুলের ব্রাঞ্চ খোলা হয়।

[শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত জীবনচরিত—১৩৪ পৃঃ]

তখনকার দিনে উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকের অভাব তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। স্কুলের বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য ইতিহাস, বিজ্ঞান নানা বিষয়ে তিনি বই লেখেন। তাঁর এই গ্রন্থগুলির প্রকাশক ছিলেন—"বি. ব্যানার্জী এ্যাণ্ড কোং"র মালিক শ্রীঅভয়াচরণ পাল। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'প্রকৃতি বিজ্ঞান' একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। পাশ্চাত্য লেখকবৃন্দের—Balfour, Stewart, Tyndall প্রভৃতির অনুসরণে সহজ ও সাধারণ ভাষায় লেখা।

সূর্যকুমার স্কুলপাঠ্য বই ছাড়াও গ্রন্থ রচনা করেছেন। নীতিধর্ম ও দর্শন বিষযক আলোচনা 'প্রবন্ধ মুক্তাবলী' একটি উল্লেখযোগ্য সঙ্কলন। 'কানন কুসুম' নামে একটি উপন্যাসও তিনি রচনা করেছিলেন।

মেট্রোপলিটান কলেজকে স্বাবলম্বী করে তুলবার জন্য তাঁর আন্তরিক প্রযত্ন ছিল। সে যুগে শ্রেষ্ঠ দুটি কলেজে—প্রেসিডেন্সি ও মেট্রোপলিটান—ছাত্রপিছু খরচ ছিল যথাক্রমে ৩৬৪ টাকা ও ৪৯ টাকা ১৩ আনা। কলেজ পরিচালনার ব্যাপারে এত অল্প ব্যযে এই সাফল্য সেদিন মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউসনেব ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেছিল।

কিন্তু কলেজ পরিচালনাব ব্যাপারে অধ্যক্ষের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের মতবৈষম্য দেখা দিল। সূর্যকুমার বযসে তরুণ। এত অল্প বযসে তাঁর এত প্রভাব ও প্রতিপত্তি অনেকেরই ঈর্ষার কারণ হযে উঠেছিল। বিদ্যাসাগরের কাছে তাঁর বিরুদ্ধে বলবার মত লোকের অভাব ছিল না। চরিত্রের বিচারে বিদ্যাসাগর ছিলেন এক প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন পুরুষ। কোন প্রতিরোধ তিনি কখনও সহ্য করেননি। যতদূর জানা যায, বিদ্যাসাগরের ব্যবহারে সূর্যকুমার ক্ষুব্ধ হযেছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন, তাঁকে বিদ্যাসাগব অবহেলা বা অবজ্ঞা করেছিলেন। সূর্যকুমার নিজেও অত্যন্ত অভিমানী ও জেদীপুরুষ ছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁদের মধ্যে মতান্তর থেকে মনান্তরের সৃষ্টি হয।

ব্যক্তিগত জীবনে সূর্যকুমাব ছিলেন বিদ্যাসাগরের জামাতা। কিন্তু এই সম্পর্কের মাধুর্যও ক্ষুণ্ণ হযেছিল। বিদ্যাসাগরের তখন শেষ বযস। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু। জীবনের এই শেষ অংশ তাঁর নানা দুর্যোগে বিপর্যস্ত। ১৮৮৮ খৃঃ'র আগস্ট মাসেই তাঁর স্ত্রী দীনমযী দেবীর মৃত্যু। একমাত্র পুত্র নারাযণেয সঙ্গে চরম বিচ্ছেদ ঘটে গেছে। দৈহিক পীড়া ও ক্লেশে তিনি শ্রান্ত।

১৮৮৮ খৃঃর সেপ্টেম্বর মাসে সূর্যকুমার কলেজ ছেড়ে যান। "সূর্যবাবু ১৩ বৎসর কাল মেট্রোপলিটনের উন্নতিসাধনে নিযুক্ত থাকিযা ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে কলেজের কার্য হইতে অবসর প্রাপ্ত হন।"

[চণ্ডিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায প্রণীত জীবনচরিত, পৃঃ ৩১৭]

সাম্প্রতিক কালের দু'একজন লেখক—অধ্যক্ষ সূর্যকুমারের এই পদত্যাগ (অথবা পদচ্যুতির) ঘটনার মধ্যে নতুন তথ্য আবিষ্কারের চেষ্টা

করেছেন। 'বিদ্যাসাগর কলেজ পত্রিকা'-তেই (আশ্বিন, ১৩৬০) ৺যতীন্দ্র মোহন ঘোষ বিদ্যাসাগরের ন্যায়পরায়ণতার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে একটি ঘটনার উল্লেখ করেন এবং বলেন, ঘটনাটি ৺মুক্তিদারঞ্জন রায়ের মুখে শোনা। ৺মুক্তিদারঞ্জন রায় সে সময় কলেজে এফ. এ. ক্লাশের ছাত্র ছিলেন, তাছাড়া তার পুত্র কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীশৈলজারঞ্জন রায় এমন কোন ঘটনার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বলেছেন—"শ্রীযুক্ত সূর্যকুমার অধিকারী বিদ্যাসাগর কলেজের প্রিন্সিপাল থাকা-কালীন কোনও গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়া সম্বন্ধে কখনও কোনও কালে কাহারও কোনও ইঙ্গিত বা অভিমতের সম্পর্কে কিছুই শুনি নাই।"

বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয়া কন্যা ৺কুমুদিনী দেবীর দৌহিত্র ডক্টর অনন্ত-প্রসাদ ব্যানার্জী শাস্ত্রী—এই প্রসঙ্গে আমাকে যা বলেছেন তার মর্ম হল ঃ—সূর্যকুমারের হাতে ইনস্টিটিউসন ও কলেজের পুরো দায়িত্ব তুলে দেওয়ায় অনেকেই খুশী হতে পারেননি। অথচ সূর্যকুমারের প্রভাবও অস্বীকার করার উপায় ছিল না। সে যুগের বৃহত্তম কলেজের অধ্যক্ষ তিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেটের সভায় তাঁর আসন ছিল ভাইসচ্যান্সেলারের আসনের পাশেই। সূর্যকুমারের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ (অধিকাংশই বেনামী) আসায় বিদ্যাসাগর একদিন তাঁকে ডাকেন। এই বৈঠকে নতুন বিল্ডিং তৈরি সম্পর্কিত কাগজপত্র নিয়ে আলোচনার সময় বিদ্যাসাগর কিছুটা রূঢ় ব্যবহার করেন। কতকগুলি কাগজের ভুল ধরে সেগুলিকে সংশোধন করার নির্দেশ দেন। বিদ্যাসাগরের এই ব্যবহারে অপমানিত সূর্যকুমার পদত্যাগ করতে চান এবং বিদ্যাসাগরও দ্বিরুক্তি করেন না।

ডক্টর ব্যানার্জী শাস্ত্রী ৺সূর্যকুমারকে দেখেছেন এবং তাঁকে জানবার সুযোগ পেয়েছেন। তিনি বলেন,—বিদ্যাসাগরের এই ব্যবহারে সূর্যবাবু মর্মাহত হয়েছিলেন। এরপরে তিনি কলকাতা ছেড়েই চলে যান।

ডক্টর ব্যানার্জী শাস্ত্রীর এই উক্তিকে আমরা প্রমাণ্য বলে গ্রহণ করতে পারি।*

* প্রবন্ধটি 'বিদ্যাসাগর কলেজ পত্রিকা'য় (১৯৬৬-৬৭) প্রকাশিত।

বিদ্যাসাগর চরিত্রের অদম্য জেদ ও প্রবল পুরুষকারের ফলেই সেদিন মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউসন বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এই শিক্ষায়তনের প্রতিষ্ঠাকে তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি হিসাবে বর্ণনা করে যা বলেছিলেন সেই উক্তিটি উদ্ধৃত করছি :

"মেট্রোপলিটান বিদ্যালয়কে তিনি যে একাকী সর্বপ্রকার বিঘ্ন-বিপত্তি হইতে রক্ষা করিয়া তাহাকে সগৌরবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলেন, ইহাতে বিদ্যাসাগরের কেবল লোকহিতৈষা ও অধ্যবসায় নহে, তাঁহার সজাগ ও সহজ কর্মবুদ্ধি প্রকাশ পায়। এই বুদ্ধিই যথার্থ পুরুষের বুদ্ধি, এই বুদ্ধি সুদূর সম্ভবপর কাল্পনিক বাধাবিঘ্ন ও ফলাফলের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারজালের দ্বারা আপনাকে নিরুপায় অকর্মণ্যতার মধ্যে জড়ীভূত করিয়া বসে না। এই বুদ্ধি · দ্বিধা বিসর্জন দিয়া মুহূর্তের মধ্যে উপস্থিত বাধার মর্মস্থল আক্রমণ করিয়া, বীরের মত কাজ করিয়া যায়।"

১৩৬০ সনের কলেজ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত স্বর্গত অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ঘোষের একটি প্রবন্ধ অধুনা কিঞ্চিৎ উত্তেজনা ও তিক্ত আলোচনার সূত্রপাত করেছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও সূর্যকুমার অধিকারী উভয়েই বাংলাদেশের স্বনামধন্য ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। অধ্যাপক ঘোষের প্রবন্ধের বক্তব্য লেখকের নিজের। প্রবন্ধের উল্লিখিত ঘটনার সত্যতা যাচাই করার মত উপকরণ কলেজ ম্যাগাজিন সম্পাদকের হাতে না থাকায় অধ্যাপক ঘোষের প্রবন্ধের পক্ষে বা বিপক্ষে মত প্রকাশের ক্ষমতা বর্তমান সম্পাদকের নেই।

সম্পাদক

বিদ্যাসাগর কলেজ পত্রিকা*

* এই প্রবন্ধ সম্পর্কে ম্যাগাজিন সম্পাদকের মন্তব্য।

বিদ্রোহী নায়ক

"বিদ্যাসাগরের করুণার প্রবাহ যখন ছুটিয়াছিল তখন কাহারও সাধ্য হয় নাই যে, সেই গতির পথে দাঁড়াইতে পারে। দেশাচারের দারুণ বাঁধ তাহা রোধ করিতে পারে নাই। সমাজের ভ্রুকুটিভঙ্গিতে তাহার স্রোত বিপরীতমুখে ফিরে নাই।...কাহারও সাধ্য হয় নাই সেই মেরুদণ্ড নমিত করে।" [রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী]।

সমাজ সংস্কারের প্রথম ধাপেই বিদ্যাসাগর সবচেয়ে দুরূহ কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। সামাজিক অনুশাসনের বিধানে তখন মেয়েদের বালিকা বয়সে বিবাহ দেওয়ার রীতি ছিল। বালিকা বয়স বললে সঠিক বলা হয় না, শিশুকালেই বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যেত। অনেক সময় এক বছর বয়সের মেয়েকে বিবাহিত হতে দেখাও আশ্চর্য হওয়ার বিষয় ছিল না। কিন্তু এই শিশু ও বালিকাগুলি বিধবা হলে বৈধব্যের কঠিন ব্রহ্মচর্য ব্রত তাদের আমৃত্যু পালন করানো হতো।

বিধবা নারীর দুঃখ তরুণ ঈশ্বরচন্দ্রকে অভিভূত করেছিল। তাঁর অতি পরিচিত একটি নারীর করুণ জীবনকাহিনী তাঁকে এত বিহ্বল করে তুলেছিল যে, তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন বিধবাবিবাহকে আইনসঙ্গত ও সামাজিক করে তুলতে হবে।

বিদ্যাসাগরের বয়স তখন চোদ্দ। কলেজের ছুটিতে তিনি বাড়ী এলেন এবং একটি নিষ্ঠুর সংবাদ পেলেন তাঁর মায়ের কাছে। তাঁর শৈশবের খেলার সাথী একটি বালিকা তখন সদ্য বিধবা হয়েছে। তার বৈধব্য বেশ, ব্রহ্মচর্য পালন ও একাদশীতে নির্জলা উপবাস বিদ্যাসাগরের মনে চাবুকের দাগ কেটে দিল।

দ্বিতীয় ঘটনা যখন ঘটে তখনও তিনি সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। বীরসিংহের একটি পরিবারে এক বিধবা যুবতী গর্ভবতী হয়ে পড়েছিল। লজ্জামোচনের জন্য সদ্যজাত সন্তানটিকে সূতিকাগৃহেই গলাটিপে মারা হয়।

তৃতীয় ঘটনাও একটি গর্ভবতী বিধবার কাহিনী। আত্মহত্যাকামী নারীটি শেষ পর্যন্ত খৃস্টধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করে আত্মরক্ষা করে।

সেদিনের হিন্দুসমাজে এ সংকল্প একক হিমালয় অভিযানের চেযেও অনেক কঠিক সংকল্প ছিল। কিন্তু বিদ্যাসাগর-চরিত্রে শুধু অমেয় করুণা নয়, করুণার সঙ্গে দুর্জয় বীর্যের মিশ্রণ ঘটেছিল। কোন বাধাকেই তিনি বাধা বলে মানেননি। সমাজের সেই বিদ্রোহী নায়ক সেদিন আপন শক্তির উপর নির্ভর করেই দুর্গম পথে যাত্রা করেছিলেন।

বিদ্যাসাগর জগতের সকল সফল সেনানাযকের মতোই জানতেন যে, যুদ্ধে জয়লাভ করতে হলে, প্রতিপক্ষকে পরাজিত করে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে উপযুক্ত অস্ত্রের প্রযোজন। ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারে নিজেকে ডুবিযে দিলেন শাস্ত্রাধ্যয়নে। সারারাত বিনিদ্র থেকে তিনি শাস্ত্রপাঠ করে চললেন। বিভিন্ন শাস্ত্র থেকে চযন করতে লাগলেন তাঁর মতের অনুকূল সূত্রগুলি। তাঁর ব্রহ্মাস্ত্র সংগৃহীত হল 'পরাশর সংহিতা' থেকে। সংগ্রহ করলেন সেই বিখ্যাত শ্লোকটি ঃ

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎস্নু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥

তারপর বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত—এ কথা প্রমাণ করে পুস্তিকা রচনা করলেন এবং সেই পুস্তিকা ছাপিয়ে বার করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দেশে যেন ঝড় উঠল। প্রবল প্রতিবাদে পণ্ডিত-সমাজ মুখর হয়ে উঠল। এত বড় দুঃসাহসিক কথা যে কেউ ঘোষণা করতে পারে এবং বিদ্যাসাগরের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তি যে এই মতের প্রবক্তা—এ কল্পনা যেন দুঃসহ হয়ে উঠল সকলের কাছে। বিদ্যাসাগরের সেই ক্ষুদ্র পুস্তিকা সেদিন যে কি বিপুল আলোড়ন তুলেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় প্রতিবাদ পুস্তিকাগুলির কথা স্মরণ করলে।

শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেব তখন সমাজের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। পুস্তিকা ছাপা হওয়ার পর বিদ্যাসাগর

তাঁকে একজন সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক হিসেবে পাওয়ার জন্য ব্যস্ত হলেন। বিদ্যাসাগরের এই প্রত্যাশা অহেতুক ছিল না। রাধাকান্ত দেব উদার ও শিক্ষিত ছিলেন এবং স্ত্রীশিক্ষার জন্য তাঁর আগ্রহ সর্বজনবিদিত। বস্তুত রাধাকান্ত দেব বিদ্যাসাগরের সবল যুক্তিতে ও রচনার বিন্যাসে মুগ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু তাকে প্রকাশ্যে সাহায্য করবার বা তাঁর মতকে সমর্থন করবার মতো সাহস তাঁর ছিল না। তাই রাজা এক চালাকি খেললেন। তিনি পণ্ডিতসমাজকে এক সভায় আহ্বান করলেন।

সেই সভায় তর্কযুদ্ধে বিদ্যাসাগর উপস্থিত পণ্ডিতসমাজের সামনে তাঁর নিজের বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। রাজা তখন বিদ্যাসাগরকে তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রস্তাবনার জন্য একজোড়া শাল পুরস্কার দিলেন।

এই ঘটনায় দেশ আবার বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। তারা সদলে হানা দিল রাধাকান্ত দেবের বাড়ী এবং জানতে চাইল যে তিনি বিদ্যাসাগরের সমর্থক কিনা। রাধাকান্ত দেব ভীত হয়ে আবার একটি তর্কসভা আহ্বান করলেন। এবং এবারে বিদ্যাসাগরের প্রতিপক্ষ নবদ্বীপের পণ্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যারত্নকে শাল দিয়ে পুরস্কৃত করলেন।

বিদ্যাসাগরের বুঝতে দেরি হল না যে, রাজার কাছে আশা করবার আর কিছু নেই। তিনি এই ঘটনায় প্রচণ্ড আঘাত পেলেন কিন্তু হতাশ হলেন না। শুধু মনে মনে বললেন, রাজার কাছে আর নয়।

চারিদিকে সেই প্রবল প্রতিবাদ—কাশীর ধর্মসভা এবং নবদ্বীপ, যশোর ও কলকাতার পণ্ডিতসমাজের সবল বিরোধিতার মুখে বিদ্যাসাগর তাঁর দ্বিতীয় পুস্তিকা বার করলেন। ১৮৫৫ সালের অক্টোবর মাসে 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা' শীর্ষক দ্বিতীয় পুস্তিকাটি বার হয় এবং এই বইটিতে তিনি তাঁর পাণ্ডিত্য ও মানবিকবোধের পূর্ণ পরিচয় দেন।

সেদিন বাংলাদেশের যতগুলি পত্রপত্রিকা ছিল, একমাত্র 'তত্ত্ব-বোধিনী' ছাড়া প্রায় সকলগুলিই বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে গিয়েছিল। বাংলাদেশের কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিই প্রকাশ্যে তাঁকে সাহায্য করতে সাহসী হননি। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও তাঁর 'বঙ্গদর্শন'-এ বিধবা-বিবাহের বিরোধিতা করে কড়া প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাঁর কাছে

প্রতিদিন ঝাঁকে ঝাঁকে চিঠি আসতে লাগল। বেশীর ভাগ চিঠিই তাঁকে ভয় দেখিয়ে লেখা। তাঁর নামে ছড়া লেখা হতে লাগল। ব্যঙ্গ করে গাল দিয়ে অজস্র পুস্তিকা ছাপা হতে লাগল। এমন কি, তিনি রাস্তায় বার হলে চারদিক থেকে তাঁকে বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গ করা হতে লাগল।

অবশ্য বিদ্যাসাগরের কাজের সমর্থক যে কোথাও ছিল না তা নয়। কিন্তু তারা সোচ্চার ছিল না। তাদের শক্তি তেমন প্রবল ছিল না। এবং তাদের সমর্থনের উপর নির্ভর করাও বিদ্যাসাগরের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি জানতেন যে, এ কাজে তাকে চরম বাধা পেতে হবে। সমস্ত বিরোধিতা সহ্য করবার জন্য প্রস্তুত হযেই তিনি নেমেছিলেন।

তাঁর প্রতিপক্ষদের মধ্যে প্রবলতমদের নামের উল্লেখ করা হয়তো অবান্তর হবে না। মুর্শিদাবাদের বৈদ্যপ্রধান গঙ্গাধর কবিরাজের নাম তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভাটপাড়ার পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্নও তাঁর প্রতিপাদ্য বিষযকে ভুল প্রতিপন্ন করবার জন্য শাস্ত্রব্যাখ্যা করেছিলেন অন্যভাবে। রাজা রাধাকান্ত দেবও জনমত সংগ্রহ করতে লাগলেন বিধবাবিবাহের বিপক্ষে। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁর 'সংবাদ প্রভাকর'-এ যে অশ্লীল ব্যঙ্গ কবিতাটি লেখেন সেটি এখানে উদ্ধৃত করছি।

"কোলে কাঁকে ছেলে ঝোলে, যে সকল রাঁড়ী।
তাহারা সধবা হবে, পরে শাঁকা শাড়ী॥
এ বড় হাসির কথা, শুনে লাগে ডর।
কেমন কেমন করে মনের ভিতর॥
শাস্ত্র নয়, যুক্তি নয়, হবে কি প্রকারে?
দেশাচারে ব্যবহারে বাধো বাধো করে॥
যুক্তি বোলে বিচার, করুন শত শত।
কোন মতে হইবে না শাস্ত্রের সম্মত॥
বিবাহ করিয়া তারা পুনর্ভবা হবে।
সতী বলে সম্বোধন কিসে করি তবে?

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে জুন সংখ্যা 'বঙ্গদর্শন'-এ বঙ্কিমচন্দ্র যা লিখলেন তার মর্মার্থ হচ্ছে এই—কেউ কেউ বলেন যে, বাংলা দেশে বিধবাদের জীবন দুর্বহ ও দুঃখময়। কিন্তু আমি মনে করি না যে, তাঁদের এই ধারণা

সত্য। যদি তর্কের খাতিরে ধরা যায় যে, বিধবা নারীর জীবন দুঃসহ, তাহলেও এ কথা মানতেই হবে যে, আমাদের সমাজে বিধবা নারীর ব্রহ্মচর্য পালনের ব্যবস্থা সমাজের পক্ষে হিতকারক। কি প্রয়োজন আছে এই সামাজিক প্রথা দূর করবার বৃথা চেষ্টা করায়। …ইত্যাদি।

বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের এই প্রচেষ্টাকে কোনদিনই মানবিক দৃষ্টিতে দেখতে চাননি এটা আমাদের কাছে আশ্চর্য বলে মনে হয়। পরবর্তী কালেও দেখা গেছে 'বিষবৃক্ষ'র কুন্দনন্দিনীর জীবনকে অহেতুক করুণ ও বিপর্যস্ত করে তুলবার মূলেও এই মনোভাবই কার্যকরী হয়েছে। 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ রোহিণীকে শেষ পর্যন্ত যে ভাবে আঁকা হয়েছে তাতে বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পনৈপুণ্যে রসাভাস ঘটেছে। সমাজনিষ্ঠ রক্ষণশীল মনোভাবের কাছে তাঁর শিল্পীমন আত্মসমর্পণ করেছে। পরবর্তী যুগে 'বিনোদিনী'র চরিত্র রবীন্দ্রনাথ যে অপূর্ব সমবেদনায় গড়েছেন তা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে।

বিদ্যাসাগরের অন্যতম জীবনীলেখক বিহারীলাল সরকারও এ বিষয়ে বিদ্যাসাগরকে ভ্রান্ত বলে মনে করেছেন। বিধবাবিবাহ বিষয়ক প্রস্তাব আইনে পরিণত হওয়ার পর Asiatic Quarterly Review-এর মতো পত্রিকাতে একটি প্রবন্ধে (Child Widow) লেখা হয়—"It has proved a dead letter. Not only does it fail to secure to a widow her civil rights to property inherited from her husband, but it has not in the least degree mitigated the religious abhorrence with which orthodox Hindus regard such re-marriages."

কবির দলের বিখ্যাত গায়ক দাশরথি রায় গান বাঁধলেন :

"বিবাহ দিতে ত্বরায় হাকিমের রয়েছে রায়,
আগে কেউ টের পায় নাই সেটা।
তারা কল্লে অর্ডর, যেতে করে অর্ডর,
চটিকে বুদ্ধি আটিকে রাখবে কেটা॥"

নদীয়া, ত্রিবেণী, ভাটপাড়া বাঁশবেড়ে ও কলকাতার পণ্ডিতসমাজের স্বাক্ষর-সম্বলিত আবেদনপত্রের সর্বাগ্রে নাম দিয়েছিলেন সে যুগের বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীরাম শিরোমণি। বিধবাবিবাহের বিরোধিতা করে লেখা এই আবেদনপত্রে বলা হয়—"Your petitioners…protest against a bill

which is opposed to the whole of their Shastras, which is contrary to the customs and usages throughout the country."

বিদ্যাসাগর জানতেন যে, ধর্মান্ধতা যে দেশের মানুষকে যুক্তিহীন ও নিষ্ঠুর করে তুলেছে, সামাজিক অনুশাসনে ও প্রচলিত সংস্কারের বাঁধনে যারা বন্দী, তাদের কাছে যুক্তির দাম থাকবে না, মানবিকতার আবেদনও নিষ্ফল হবে। তাই তিনি তাঁর পুস্তিকা দুটিকে একত্র করে তার ইংরেজি অনুবাদ বার করলেন: Marriage of Hindu Widows. উদ্দেশ্য—শাসক গোষ্ঠীকে, শিক্ষিত ইংরেজ কর্মচারীবৃন্দকে এই নিষ্ঠুর অযৌক্তিক প্রথার নির্মমতার সঙ্গে পরিচিত করা, এবং বিধবাবিবাহের অনুকূলে আইন সৃষ্টির জন্য চেষ্টা করা। ১৮৫৫ সালের ৪ঠা অক্টোবর তিনি এক হাজার ব্যক্তির স্বাক্ষর-সম্বলিত একটি আবেদনপত্র পাঠালেন ভারত সরকারের কাছে।

এই প্রসঙ্গে বলার প্রয়োজন আছে যে, এই আবেদনের বিরুদ্ধে অর্থাৎ বিদ্যাসাগর-প্রস্তাবিত বিধবাবিবাহ-সম্পর্কিত আইনের বিরোধিতা করে সেদিন চল্লিশটিরও বেশী আবেদনপত্র এসে পড়ল ভারত সরকারের হাতে। এই আবেদনপত্রগুলিতে যাঁরা স্বাক্ষর দিয়েছিলেন তাঁদের সংখ্যা ষাট হাজারেরও বেশী। এবং এঁদের মধ্যে রাজা রাধাকান্ত দেব পুরোভাগেই ছিলেন।

তদানীন্তন লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে বিলটি পেশ করেন জে. পি. গ্রান্ট। বিরুদ্ধপক্ষের সমবেত বিরোধিতার উত্তরে গ্রান্ট সেদিন বলেছিলেন—"If I know certainly that but one little girl would be saved from the horrors of brahmacharya by the passing of this act, I will pass it for her sake." ১৮৫৬ সালের ২৬শে জুলাই বিলটি গভর্নর জেনারেলের অনুমোদন লাভ করে আইনে পরিণত হয়।

বিদ্যাসাগরের স্বপ্ন সফল হলো। তাঁর দুর্বার সংগ্রাম ও নির্ভীক বিবেকের শক্তি জয়যুক্ত হলো। কিন্তু দেশবাসী তাঁকে ক্ষমা করেনি। তাঁর নামে কুৎসা রটনা করে প্রচুর রচনা প্রকাশিত হতে লাগল। কাশী থেকে বারোজন ব্রাহ্মণ তাঁর বাড়ীতে এসে উপবীত ছিন্ন করে তাঁকে অভিশাপ দিয়ে গেল। "বিদ্যাসাগর পথে বাহির হইলে চারিদিক হইতে

লোক আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিত; কেহ পরিহাস করিত, কেহ কেহ প্রহার করিবার—এমন কি মারিয়া ফেলিবার ভয় দেখাইত।…… তিনি কাহারও মুখাপেক্ষী না হইয়া স্বয়ং একাকী বিশ্বজয়ী বীরের ন্যায় যুঝিয়াছিলেন।" [বিহারীলাল সরকার]

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, বিধবাবিবাহ অনুমোদন করে আইনে পরিণত হওয়া এক জিনিস, আর সমাজে সেই প্রথা চালু হওয়া সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। সামাজিক ধারাকে পরিবর্তিত করা, বিশেষত ধর্মীয় বিশ্বাস যে ধারার মূলে—সে ধারার গতিপথ সম্পূর্ণ বদলে দেওয়ার জন্য প্রবলতর শক্তির প্রয়োজন হয়। যাঁরা বিদ্যাসাগরকে শ্রদ্ধা করতেন এবং এই ব্যাপারেও নানাভাবে সাহায্য করেছেন তাঁদেরও মধ্যে অনেকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন না যে, বিধবাবিবাহ চালু হতে পারে বা চালু হওয়ার প্রয়োজন আছে। দীর্ঘকাল পরে আজও মানুষের মনোভাব এ বিষয়ে যথেষ্ট অগ্রসর বলে আমি মনে করি না। ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে আমরা নারীদরদী বলে জানি। তিনি বিধবা নারী, এমন কি পতিতাদের বেদনায় গভীর যন্ত্রণা অনুভব করেছেন। সে যন্ত্রণা আন্তরিক ও স্বতোজাত। তবু একাধিকবার শরৎচন্দ্র স্বীকার করেছেন যে, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, বিধবাদের পুনর্বিবাহে অনুমতি না দেওয়া স্ত্রীজাতির প্রতি পুরুষজাতির অন্যায়ের একটা জঘন্য দৃষ্টান্ত। সংসারে অনেক পাপতাপের এই মূল কারণ। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, বিধবাবিবাহ দেবার অনুমতির দায়িত্ব যখন আমার উপরে আসে তখন অন্তর থেকে সে অনুমতি আমি দিতে পারি নে।" বোধহয় হৃদয়ের অনুভূতি ও সংস্কারের প্রতি অনুরক্তির এই সংঘাতের ফলেই তাঁকে 'অভয়া'র মতো মেয়েকে বর্মায় টেনে নিয়ে যেতে হয়েছিল, এবং 'রমা'র পরিণতিকে এত করুণ করে তুলতে হয়েছিল। সে যুগে অনেকেই যে বাস্তব ক্ষেত্রে পেছিয়ে যাবেন—এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। বস্তুতঃ রাজা রামমোহন রায়ের পুত্রও শেষ পর্যন্ত বিধবাবিবাহের সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকতে রাজী হননি।

বিধবাবিবাহ আইনসম্মত হওয়া সত্ত্বেও কেউ এই ব্যাপারে অগ্রসর হলো না। কিন্তু বিদ্যাসাগরও শুধুমাত্র খাতাকলমের মাধ্যমে তাঁর মতামতকে সীমাবদ্ধ করে রাখবার পাত্র ছিলেন না। তাঁর জেদ ছিল

অপরিসীম। তিনি বুঝলেন অন্তত কয়েকটি বিবাহের সংঘটন্ ঘটাতে না পারলে এই আইনের কোন ফলাফল পাওয়া যাবে না। যা সত্য তা চিরকালের সত্য। সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞা যাঁর, যাঁর সমস্ত সত্যবোধের প্রেরণা মানবকল্যাণের আকাঙ্ক্ষা থেকে জাত, তিনি যে নেপথ্য ভূমিকায় থেকে যাবেন এ হতে পারে না। তাঁর মানবিক-বোধ থেকেই বিদ্যাসাগর অনুভব করেছিলেন যে, সমাজ মানুষের জন্য; অন্ধ-সংস্কারের শৈবাল যখন সমাজের মানবমুখী স্রোতকে স্তব্ধ করে, তখন সে স্রোতকে প্রবহমান করতে হয়। এবং তা করা যায় শুধু সংস্কারের মূলোচ্ছেদ করতে পারলে। বিদ্যাসাগর তাই শপথ নিয়েছিলেন যে, এই হৃদয়হীন সমাজকে তিনি পরিবর্তিত করবেন।

এ কথা আবার মনে করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন আছে যে, সে যুগে সাত কিংবা আট বছর বয়সের বালিকাবিধবার সংখ্যা অগণিত ছিল। এবং বিদ্যাসাগর শুধুমাত্র এই বালবিধবাদের বিবাহ ঘটাতেই সক্রিয় হয়েছিলেন। শিশু ও বালবিধবাদের বিবাহ দেবার জন্য তিনি সব রকম বিপদের ঝুঁকি নিতে রাজী হয়েছিলেন। এমন কি, জীবন বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত ছিলেন না।

বিধবাবিবাহবিষয়ক আইন গ্রন্থিত হওয়ার পর প্রথম বিবাহ সম্পন্ন হয় ১৮৫৬ সালের ৭ই ডিসেম্বর; বাংলা ১২৬৩ সালের ২৪শে অগ্রহায়ণ। পাত্রী ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা কালীমতী দেবী তার ছ বছর বয়সে বিধবা হয়েছিল। পুনর্বিবাহ হলো দশ বছর বয়সে শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন (ভট্টাচার্যের) সঙ্গে। বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়ীতে বিয়ের আয়োজন করা হয়। বিদ্যাসাগর এই প্রথম দিনটির সম্বন্ধে বিশেষভাবে সতর্ক ছিলেন। পাছে বাধা আসে তাই পুলিস প্রহরার ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। পাত্রের পালকি নিজে পাহারা দিয়ে নিয়ে আসেন। বিয়ের সমস্ত খরচও তিনি দেন।

এর পর একের পর একটি করে বিধবাবিবাহ ঘটাতে লাগলেন তিনি। বলা বাহুল্য এর জন্য যে প্রচুর ব্যয় হতো তার ফলে তিনি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। C. E. Buckland তাঁর 'Bengal Under The Lieutenant Governors' গ্রন্থে লিখেছিলেন—"To help the movement he ran heavily in debt."

বিহারীলাল সরকার তাঁর গ্রন্থে একটি হিসেব দিয়েছিলেন। তিনি লেখেন—মোট ৬০টি বিবাহে তাঁর ৮২ হাজার টাকা ব্যয় হয়। কিন্তু শুধু অর্থ ব্যয় নয়, নানাভাবে তাঁকে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল।

শুধু ভীতি প্রদর্শন নয়, একবার রাস্তার মধ্যে তাঁর প্রাণনাশের উদ্দেশ্যে কয়েকটি ভাড়াটে গুণ্ডা তাঁকে আক্রমণ করে। কিন্তু তাঁর সঙ্গী ভৃত্য শ্রীমন্তর লাঠির খেলাই সেদিন তাঁর প্রাণরক্ষা করে। একবার বিদ্যাসাগর শুনলেন, কোন ধনী লোক তাঁকে মারবার জন্য লোক নিযুক্ত করেছে। বিদ্যাসাগর সঙ্গে সঙ্গে সেই ভদ্রলোকের বাড়ীতে হাজির হলেন। একাই তাঁর সামনে এসে বললেন, শুনলাম আমাকে মারবার জন্য আপনি টাকা খরচ করে লোক নিযুক্ত করেছেন। তা আমি নিজেই এসেছি আপনার কাছে। আমি একা। আপনি ইচ্ছে করলে মারতে পারেন আমাকে।

ধনী লোকটি তখন অনেকগুলি বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আড্ডায় বসেছিলেন। বিদ্যাসাগরের কথায় তিনি লজ্জিত হলেন ও ক্ষমা চাইলেন তাঁর কাছে।

সমস্ত দেশেই তুমুল আলোড়ন উঠেছিল। কিন্তু অবিচল ছিলেন একা বিদ্যাসাগর। এমন কি, তিনি এ বিষয়ে কারও সাহায্যের প্রত্যাশী হতেন না। Hindu Patriot পত্রিকা একবার একটি সাহায্য ভাণ্ডার গড়ে তোলার প্রস্তাব করে। বিদ্যাসাগর ক্ষিপ্ত হয়ে বলেন, কারও সাহায্যের প্রয়োজন নেই। আমার ঋণ আমিই শোধ করব। বলা বাহুল্য, তাঁর জীবিতকালেই সমস্ত ঋণ তিনি শোধ করে যেতে পেরেছিলেন।

তাঁর মায়ের উৎসাহ ও পিতার অকুণ্ঠ সমর্থন যে তাঁর প্রেরণাস্বরূপ ছিল এ কথা বিদ্যাসাগর নিজেই স্বীকার করেছেন। বাধা এসেছিলো তাঁর পরমশ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরু প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের কাছ থেকে। গুরুর প্রতি অসীম শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর দমিত হননি ; বরং গুরুকে প্রকাশ্যে অগ্রাহ্য করেছেন।

নারীর বন্ধু

"তিনি তাঁর করুণার ঔদার্যে মানুষকে মানুষরূপে অনুভব করতে পেরেছিলেন"—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিদ্যাসাগর তাঁর 'বহুবিবাহ' শীর্ষক গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছিলেন—"স্ত্রীজাতি অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল ও সামাজিক নিয়মদোষে, পুরুষজাতির নিতান্ত অধীন। এই দুর্ব্বলতা ও অধীনতানিবন্ধন, তাঁহারা পুরুষজাতির নিকট, অবনত ও অপদস্থ হইয়া কালহরণ করিতেছেন। প্রভুতাপন্ন প্রবল পুরুষজাতি, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া, অত্যাচার ও অন্যায়াচারণ করিয়া থাকেন; তাঁহারা নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, সেই সমস্ত সহ্য করিয়া জীবনযাত্রা সমাধান করেন। পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বপ্রদেশেই, স্ত্রীজাতির ঈদৃশী অবস্থা। কিন্তু, এই হতভাগ্য দেশে, পুরুষজাতির নৃশংসতা, স্বার্থপরতা, অবিমৃষ্যকারিতা প্রভৃতি দোষের আতিশয্যবশতঃ স্ত্রীজাতির যে অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা অন্যত্র কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। অত্রত্য পুরুষজাতি, কতিপয় অতিগর্হিত প্রথার অনুবর্ত্তী হইয়া, হতভাগা স্ত্রীজাতিকে, অশেষপ্রকারে, যাতনা প্রদান করিয়া আসিতেছেন। তন্মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা, এক্ষণে, সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর অনর্থকর হইয়া উঠিয়াছে। এই অতি জঘন্য, অতি নৃশংস প্রথা প্রচলিত থাকাতে, স্ত্রীজাতির দুরবস্থার ইয়ত্তা নাই।" [বিদ্যাসাগরের গ্রন্থাবলী : বহুবিবাহ, পৃঃ ৩৪৮]

ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে নারীর লাঞ্ছনা সবদিক থেকে চরমে পৌঁছেছিল এর কারণ পুরুষের নির্দয়তা ও সংস্কারজনিত আচারপরায়ণতা। নারীর এই লাঞ্ছনার মুলে যে সংস্কার সেদিনের সমাজকে একপেশে

করে রেখেছিল তা হচ্ছে প্রথম—বাল্যবিবাহ, দ্বিতীয়—বিধবার নির্যাতন, তৃতীয়—বহুবিবাহ। বাল্যবিবাহ অর্থাৎ নারী ঋতুমতী হওয়ার পূর্বে তার বিয়ে দিতে হবে; দ্বিতীয়তঃ কুলীন ব্যবস্থা থাকায় কুলরক্ষার তাগিদে সেই বালিকাকে হয়ত বিয়ে করতে হতো মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধকে। বিধবা নারীর (বালিকার) আজীবন কঠোর কৃচ্ছ্রতা এবং কুলরক্ষার তাগিদেই একবরে বহুকন্যাকে সম্প্রদানের ব্যাপার সেদিন স্বাভাবিক ঘটনা ছিল।

বিদ্যাসাগর সমাজসংস্কারের তাগিদ অনুভব করেছিলেন তাঁর সমবেদনাশীল, করুণার্দ্র হৃদয় থেকে। তাই সমাজের এই তিনটি দুর্নীতির বিরুদ্ধেই তাঁর যুগপৎ সংগ্রাম। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত সে সংগ্রাম থেকে তিনি বিরত হননি।

রাজা বল্লাল সেন হিন্দু ব্রাহ্মণের কুলবন্ধন করেছিলেন গুণবিচার করে। কালক্রমে কুলীনদের মধ্যে যখন অজস্র দোষ দেখা দিল তখন দেবীবর ঘটক কুলীনদের মেলবন্ধন করেন দোষবিচার করে। দেবীবরের নিয়মে উচ্চমেলের কন্যার বিবাহ উচ্চমেলের (বা সম্প্রদায়ের) পাত্রেই দিতে হবে। কিন্তু এমন পাত্র দুর্লভ হওয়ায় কুলরক্ষার জন্য বহুপত্নীক কুলীনকেই কন্যাদান করা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং এটা কুলীনদের ব্যাবসা হয়ে দাঁড়ালো। ফলে কুলীন ব্রাহ্মণরা হয়ে উঠলো কশাইয়ের মত নৃশংস, আর কুলের যূপকাষ্ঠে আবদ্ধ বালিকাদের ভাগ্য অসহায় ও করুণ হয়ে পড়লো।

বিদ্যাসাগর তাঁর 'বহুবিবাহ' গ্রন্থের 'তৃতীয় আপত্তি' পরিচ্ছেদে এই ধরনের কয়েকটি কুলীন স্বামীর পরিচয় দিয়েছেন:

"কোন প্রধান ভঙ্গ কুলীনকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ঠাকুরদাদা মহাশয়, আপনি অনেক বিবাহ করিয়াছেন, সকল স্থানে যাওয়া হয় কি? তিনি অম্লান মুখে উত্তর করিলেন, যেখানে ভিজিট (visit) পাই সেইখানে যাই।"

"গত দুর্ভিক্ষের সময় একজন ভঙ্গকুলীন অনেকগুলি বিবাহ করেন। তিনি লোকের নিকট আস্ফালন করিয়াছিলেন, এই দুর্ভিক্ষে কতলোক অন্নাভাবে মারা পড়িয়াছে; কিন্তু আমি কিছুই টের পাই নাই; বিবাহ করিয়া স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিয়াছি।"

বিদ্যাসাগর আরও উদাহরণ দেন, যে-কন্যা বিবাহের পর আর স্বামীর মুখ দেখেনি, সে গর্ভবতী হলে কন্যার পিতা বহু টাকার বিনিময়ে সেই কন্যার স্বামীকে এক রাত্রির জন্যে নিয়ে আসতেন। যাতে কন্যার পুত্র বৈধ বলে গণ্য হতে পারে। এর ফল হতো এই যে ছেলে বা মেয়ে তার বাপকে চিনতো না। ভাগ্নে ও ভাগ্নীকে পালন করার দায়িত্ব নিতে হতো মামাদের। এবং সেই অবাঞ্ছিতদের দুর্গতির আর সীমা থাকতো না। বিদ্যাসাগরের মানবমুখী মন নারীর এই অমেয় নির্যাতনে বিগলিত হয়েছিল নিশ্চয়ই। তাঁর 'বহুবিবাহ' গ্রন্থে বিদ্যাসাগর বলেছেন—"তাঁহাদের যন্ত্রণার বিষয় চিন্তা করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়।"

বিদ্যাসাগরের দেহে হৃদয় নামে একটি বস্তু ছিল। সেদিনের সমাজে এই 'হৃদয়' থাকাটা একান্ত অপরাধ ছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু যিনি সমাজকে ক্লেদমুক্ত করতে এসেছেন, সমাজের অন্যায় প্রথাকে তিনি ঘৃণা করবেন এবং ওই প্রথাগুলির উচ্ছেদের জন্য জীবন পণ করবেন, এটাই স্বাভাবিক। বিধবাবিবাহ সমাজস্বীকৃত করানোর জন্য সমগ্র দেশের বিরুদ্ধে যখন পাহাড়ের মত দৃঢ় হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন বিদ্যাসাগর, তখনই তাঁর সংকল্প গ্রহণ করা হয়ে গেছে যে 'বহুবিবাহ'র মত নিষ্ঠুর প্রথারও উচ্ছেদ করতে হবে।

১৮৫৫ সালের ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে প্রথম আবেদনপত্র পেশ করেন তিনি। কিন্তু জনবিক্ষোভের ভয়ে এবং ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের ফলে সে আবেদন সরকারী নথিপত্রের তলায় চাপা পড়ে রইলো। চাপা পড়ে রইলো আরও, কারণ বিদ্যাসাগর তখন বিধবা-বিবাহ শিক্ষাসংস্কার ও শিক্ষার প্রসার ও অন্য নানা কাজে ব্যাপৃত। কিন্তু ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে তিনি নতুন করে এ ব্যাপারে অগ্রণী হলেন। ১৮৬৬—১লা ফেব্রুআরি তারিখে বিদ্যাসাগর নতুন যে আবেদনপত্রটি রচনা করলেন, তাতে তাঁর নামের তলায় অন্য যাঁরা স্বাক্ষর দিলেন তাঁদের মধ্যে নদীয়ার সতীশচন্দ্র রায়, ভূকৈলাসের সত্যশরণ ঘোষাল, ও কাঁদির প্রতাপচন্দ্র সিংহের নাম উল্লেখযোগ্য। এই নতুন আবেদনপত্রটি লেফ্-টেনেন্ট গভর্নর সেসিল বিডনের কাছে দাখিল করা হলো। উপসংহারে লেখা হলো—

"It is the fervent hope and prayer of your petitioners that before your Honour laid down the responsibilities of your office, your Honour might signalise the close of your long and successful career by emancipating the females of Bengal from the pains, cruelties and attendant crimes of the debasing custom of polygamy."

১৯শে মার্চ তারিখে বিদ্যাসাগর সদলে দেখা করলেন গভর্নর সাহেবের সঙ্গে। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ছিলেন রাজা সত্যশরণ ঘোষাল, পণ্ডিত ভারতচন্দ্র শিরোমণি, জাস্টিস্ দ্বারকানাথ মিত্র, প্যারীচরণ সরকার, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, কৃষ্ণদাস পাল প্রমুখ ব্যক্তিরা। বর্ধমানের মহারাজা মহাতাপচাঁদও চিঠি দিলেন বিদ্যাসাগরের প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে। ২৬শে মার্চ তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়টে' প্রস্তাবের অনুকূলে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখা হলো। গভর্নর জেনারেলের নির্দেশে তখন একটি অনুসন্ধান কমিটি বসানো হয়। কিন্তু সেক্রেটারি অব্ স্টেট্ ইতিমধ্যেই তাঁর রিপোর্টে জানান যে, বর্তমানে এ ধরনের কোন আইন (অর্থাৎ বহুবিবাহ নিষিদ্ধকরণ) বিধিবদ্ধ করা যুক্তিযুক্ত হবে না।

বিদ্যাসাগর যে অমেয় চরিত্রের অধিকারী ছিলেন সে চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, 'পরাজয়', 'হতাশা', প্রভৃতি শব্দগুলি তার পরিধির মধ্যে স্থান পায়নি। যিনি সংগ্রামী, সংগ্রামে তার জয় সব সময়েই হবে এমন আশা করা দুরাশা মাত্র। বিফলতা বিদ্যাসাগরের জাবনেও এসেছে। কিন্তু বিদ্যাসাগর সে বিফলতাকে মেনে নেননি। পরাজয়কে মেনে নিয়ে তিনি কখনও নিষ্ক্রিয় হননি। যখন স্বজনবান্ধব সকলে তাকে পরিত্যাগ করেছে তখন তিনি একক সৈনিকের মতই অগ্রসর হয়েছেন।

বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করে আইন পাশ করানো গেল না। তখন বিদ্যাসাগর তাঁর লড়াইয়ের কৌশল বদলালেন। তিনি বুঝলেন যে এই কুৎসিত প্রথার বিরুদ্ধে জনমানসকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে। যে সমাজে শাস্ত্রের অনুশাসন একমাত্র কার্যকরী সে সমাজে বিপ্লব ঘটাতে গেলে শাস্ত্রকেই শস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। তাই আবার শাস্ত্রমন্থন করলেন তিনি। উদ্ধার করে আনলেন সেই সব শ্লোক যা তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহায়ক।

অর্থাৎ বহুবিবাহের সমর্থন আছে কোন্ কোন্ অবস্থায়?

মনু বলেছেন—

মদ্যপাসাধুবৃত্তা চ প্রতিকূলা চ যা ভবেৎ।
ব্যাধিতা বাধিবেত্তব্যা হিংস্রার্থঘ্নী চ সর্ব্বদা॥ ৯।৮০। (৫)

অর্থাৎ যদি স্ত্রী সুরাপায়িনী, ব্যভিচারিণী, সতত স্বামীর অভিপ্রায়ের বিপরীতকারিণী, চিররোগিনী, অতিক্রূরস্বভাবা ও অর্থনাশিনী হয় তাহা হইলে পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবে।

এবং—

বন্ধ্যাষ্টমেঽধিবেদ্যাব্দেদশমে তু মৃতপ্রজা।
একাদশে স্ত্রীজননী সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী॥ ৯।৮১।(৫)

অর্থাৎ যদি স্ত্রী বন্ধ্যা হয় তাহলে অষ্টমবর্ষে, মৃতপুত্রা হলে দশমবর্ষে, কেবল কন্যাসন্তানের জননী হলে একাদশ বর্ষে এবং অপ্রিয়বাদিনী হলে অবিলম্বে পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবে।

অতঃপর--

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতাস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোঽবরাঃ॥ ৩।১২

অর্থাৎ দ্বিজাতির (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) পক্ষে প্রথম অর্থাৎ ধর্মার্থ বিবাহে সবর্ণা অর্থাৎ স্বজাতীয়া কন্যা বিহিত। কিন্তু যাহারা রতিকামনায় বিবাহ করে তাহারা বর্ণান্তরে বিবাহ করিবে।

কলিযুগে অসবর্ণা বিবাহের ব্যবহার রহিত হইয়াছে; সুতরাং যদৃচ্ছা-প্রবৃত্ত বিবাহ অশাস্ত্রীয়।

বিদ্যাসাগর আরও বললেন যে, কোন কোন লোক পৌরাণিক রাজাদের উদাহরণ দিয়ে থাকেন। ভারতবর্ষীয় রাজারা স্ব স্ব অধিকারে এক প্রকার সর্বশক্তিমান ছিলেন। রাজারা উন্মার্গগামী হলে তাঁদের ন্যায়পথে চালিত করবার মত লোক ছিল না। যদি কোন রাজা উচ্ছৃঙ্খল হন, তাহলে সেই উচ্ছৃঙ্খলতাকে শিষ্টাচার ও শাস্ত্রসম্মত বলা চলে না। তাই "এই অতি জঘন্য অতি নৃশংস ব্যাপার শাস্ত্রানুগত বা ধর্ম্মানুগত ব্যবহার নহে।"

বিদ্যাসাগরের এই গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে

প্রবল প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। "The whole of Bengal was in a perturbed state at that time." (Subal Chandra Mitra)

যাঁরা অগ্রণী হযে প্রতিবাদ পুস্তিকা রচনা করলেন তাঁরা হলেন—সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণশাস্ত্রের অধ্যাপক তারানাথ তর্কবাচস্পতি, সংস্কৃত কলেজের কাব্যশাস্ত্রের অধ্যাপক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, মুর্শিদাবাদ নিবাসী কবিরাজ গঙ্গাধর কবিরত্ন, বরিশাল নিবাসী রাজকুমার ন্যায়রত্ন এবং ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্ন।

এঁদের মধ্যে তারানাথ তর্কবাচস্পতি ছিলেন বিদ্যাসাগরের সুহৃদ ও বিশেষ অন্তরঙ্গদের অন্যতম। তিনি ইতিপূর্বে বহুবিবাহ নিরোধ বিষয়ক আবেদনপত্রে স্বাক্ষর দিযেছিলেন। কিন্তু তিনি হঠাৎ 'বহুবিবাহ শাস্ত্র-সম্মত' এই বিরুদ্ধমত প্রকাশ করায় বিদ্যাসাগর বিস্মিত ও ব্যথিত হন। তারানাথ সংস্কৃত ভাষায় রচিত তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্যের প্রতি কটাক্ষ করতেও ছাড়েননি। ফলে বিদ্যাসাগর দু'মাসের মধ্যেই (১৮৭২ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বর) তাঁর দ্বিতীয় পুস্তক রচনা করলেন। এই পুস্তকে প্রতিপক্ষের প্রত্যেকটি যুক্তিকে তিনি খণ্ডন করেন। তারানাথ তর্কবাচস্পতির প্রতি তিনি এতই বিক্ষুব্ধ হন যে তাঁর সঙ্গে সকল সম্পর্কের ছেদ ঘটে।

তারানাথ তর্কবাচস্পতি ও অন্যান্য প্রতিবাদীরা প্রত্যেকেই পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু পাণ্ডিত্য এক জিনিস আর হৃদয়বানতা অন্য জিনিস। যে পাণ্ডিত্য 'মানুষের ধর্ম' কি তা বুঝতে শেখেনি সে পাণ্ডিত্য নিষ্ফল। বিদ্যাসাগর বিদ্যার সাগর ছিলেন কিনা সে কথা তত বড় নয়; কিন্তু তাঁর সমস্ত হৃদয় যে মানুষের বেদনাকে অনুভব করে মানব কল্যাণে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল সে কথা মানব সমাজ আজও বিস্মৃত হয়নি। বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রজ্ঞান উদারচিত্ততার স্নিগ্ধধারায় সঞ্জীবিত হয়েছিল বলেই সমাজের ঊষর মরুচিত্তে তিনি এতবড় পরিবর্তনের প্লাবন আনতে পেরেছিলেন।

বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করে কোন আইন প্রণয়ন করা সেদিনই সম্ভব হয়নি। তার কারণ ১৮৫৬ সালে বিধিবদ্ধ বিধবাবিবাহবিষয়ক আইন সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম কারণগুলির মধ্যে একটি—এ কথা অনেকেই বলেছিলেন। বিদেশী শাসকের কাছে সাম্রাজ্যরক্ষার প্রশ্নই

বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু বহুবিবাহ যে নৃশংস প্রথা এ কথা সেসিল বিডন থেকে শুরু করে সকলেই মেনে নিয়েছিলেন। তবুও বর্ণহিন্দুর সমাজে সকলে এই প্রথা অশাস্ত্রীয় এ কথা মানতে রাজী ছিলেন না। সমাজে যারা আপন প্রতিষ্ঠা ও স্বার্থবুদ্ধিকে কায়েম করে রাখতে চায় তাদের একটি দলই সেদিন বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু মানবিকতার অধিকার রক্ষার জন্য যাঁদের হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও তাগিদ ছিল, তাঁরা বিদ্যাসাগরকে অনুসরণ করতে দ্বিধা করেননি। বলা বাহুল্য বিদ্যাসাগরের সংগ্রাম সফল হয়েছিল। কারণ বহুবিবাহ অতঃপর শিক্ষিত সমাজে ধিক্কৃত হয়েছিল এবং বাল্য-বিবাহরূপ কৌতুকজনক রীতিরও আস্তে আস্তে বিলোপ ঘটেছিল। সমাজমানসে বিদ্যাসাগরের নেতৃত্ব সেদিন যে তরঙ্গের সৃষ্টি করেছিল, তারই আলোড়নে পুঞ্জীভূত ক্লেদ ও দূষিত জল আপনা থেকেই সরে গিয়েছিল।

মহান অধমর্ণ

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর সংস্কৃত প্রেস ও প্রেস ডিপোজিটরি স্থাপন করেন; এবং ছাপা ও প্রকাশনার কাজ একসঙ্গে শুরু করেন। সংস্কৃত কলেজে তাঁর বেতন ছিল পাঁচশো টাকা, কিন্তু বই বিক্রির আয় ছিল অনেক বেশী; মাসে চার হাজার টাকার ওপর। অথচ বিদ্যাসাগরকে সারাজীবন ধরেই ঋণ করতে হয়েছে। পরিচিত বন্ধুবান্ধব ছাড়াও সে যুগের অনেক বিখ্যাত লোকের কাছেও তাঁকে ঋণ-গ্রহণ করতে হয়েছে। তার কারণ আয়ের তুলনায় ব্যয় ছিল অনেক বেশী।

ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর বিলাসের কোন স্থান ছিল না। তাঁকে ঋণ করতে হয়েছে তিনটি কারণে। প্রথমতঃ—বদান্যতা, অবাধ ও অকুণ্ঠ দান; দ্বিতীয়তঃ—বিধবাবিবাহ ও তজ্জনিত ব্যয়; তৃতীয়তঃ—শিক্ষাবিস্তারের কাজে ব্যয়।

তাঁর এই ঋণ বিদ্যাসাগর পুরোপুরি শোধ করে গিয়েছিলেন। মৃত্যুর অনেক আগেই তিনি নিজেকে ঋণমুক্ত করেছিলেন। সুবলচন্দ্র মিত্র তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন—"Before his death he had repaid all his debts. He left his property quite free from embarrassments." কিন্তু বিদ্যাসাগর কত টাকা দানের জন্যে ব্যয় করেছিলেন, বা মোট কত টাকা তাঁকে ঋণ করতে হয়েছিল, সে হিসাব সঠিকভাবে পাওয়া অসম্ভব। তিনি দান করতেন, অনেক সময় গ্রহীতার পক্ষেও জানা সম্ভব হতো না দাতার পরিচয়। তাঁর ঋণ কত এ কথা জানাতেও তিনি কুণ্ঠিত। কারণ তিনি পরার্থে কাজ করেছিলেন, নিজের স্বার্থে নয়। ঋণগ্রহণ না করে তাঁর যেমন উপায় ছিল না, তাঁকে ঋণ দিতে পেরেও

তেমনি অনেকে কৃতার্থবোধ করতেন। এই আদান-প্রদানের মধ্যে মানবিকতার যে সূক্ষ্ম আবেদন থেকে গেছে, সেটুকুও উপেক্ষার যোগ্য নয়।

মানুষের বেদনায় যেমন অপরিমেয় তাঁর করুণা, তেমনি অকুণ্ঠ তাঁর প্রকাশ। অথচ একান্ত গোপন ছিল এই বদান্যতার প্রবাহ; হয়ত কোন হিসেবই তিনি রাখেননি। তবু দু'একটি ঘটনার কথা বাংলা দেশের মানুষের মনে স্মরণীয় হয়ে আছে।

রাধানগরের জমিদার শিবনারায়ণ চৌধুরীর আকস্মিক মৃত্যুর পর তাঁর নাবালক পুত্রেরা বিদ্যাসাগরের শরণাপন্ন হয়। জমিদারি তখন ৭৫০০০ টাকা ঋণের দায়ে রমাপ্রসাদ রায়ের কাছে বন্ধক দেওয়া আছে। আসলের সঙ্গে সুদ যোগ হয়ে এক লক্ষে দাঁড়িয়েছে ঋণ। বিদ্যাসাগর বহু চেষ্টায় ব্যক্তিগত মুচলেকায় ঋণের এই টাকা সংগ্রহ করে নাবালকদের সম্পত্তি রক্ষা করেছিলেন।

কবি মাইকেল মধুসূদনকে অপমান ও লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা করবার জন্য ঋণ করে তাঁর কাছে মোট দশ হাজার টাকা পাঠিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর।

ঋণের দায়ে এক অপরিচিত ব্রাহ্মণের লাঞ্ছনা হতে দেখে তিনি কোর্টে নিজের নাম গোপন করে ব্রাহ্মণের সমস্ত ঋণ (২৪০০ টাকা) শোধ করে দেন।

ঘটনা অগণিত। বহুলোককে নিয়মিত মাসহারা দিতেন, তার কিছুটা অনুমান করা যায় তাঁর উইলের বিবরণ থেকে। কিন্তু বিক্ষিপ্ত অসংখ্য দানের তালিকা পাওয়া অসম্ভব।

বিধবাবিবাহের কাজে তাঁকে সাহায্য করতে অনেকেই রাজী ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ অন্যের কাছে নিজেকে গ্রহীতা করে তুলতে তিনি রাজী ছিলেন না। সুবলচন্দ্র মিত্র তাঁর ঋণের সাময়িক একটি খতিয়ান তৈরি করবার চেষ্টা করেছিলেন—

"Immediately after his retirement from service he had given no less than fifteen widows in marriage in different parts of the Hoogly district in the course of one year. We have already said that he had to bear all the expenses of

these marriages. He had besides to provide for the maintenance of the married couples and their families. ·· His debt had amounted to nearly 50,000 rupees·· etc ··"

বিধবাবিবাহজনিত ঋণের একটি প্রকাশ্য বিবরণী বেরোয় ১৮৬৭ সালের হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকায়। বিদ্যাসাগরকে ঋণমুক্ত করবার সদিচ্ছায় হিন্দু পেট্রিয়ট-এর সম্পাদক ও অপর কয়েকজন ব্যক্তি একটি আবেদন ছাপিয়ে 'বিধবাবিবাহ' ফাণ্ডে অর্থ-সাহায্যের জন্য সকলকেই আহ্বান জানান। এই সময় বিদ্যাসাগর তাঁর গ্রাম বীরসিংহে ছিলেন। গ্রাম থেকে ফিরে এসে এই আবেদনের কথা শুনে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তখনই প্রতিবাদ জানিয়ে হিন্দু পেট্রিয়টে তিনি চিঠি দিলেন। সে চিঠির মর্মার্থ হলো :

"বহুদিনের পর আমি বাড়ী হইতে কলিকাতায় আসিলাম। আসিয়া শুনিলাম, বিধবাবিবাহ সংস্কারের জন্য অনেকগুলি টাকা ঋণ হইয়াছে বলিয়া, চাঁদা তুলিয়া সেই ঋণ শোধের নিমিত্ত একটা ফাণ্ড্ স্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে ; বলা হইয়াছে আমি সেই ঋণ করিয়াছি। শুনিয়া আমি আশ্চর্যান্বিত হইলাম। দেশী ইংরাজী সকল সংবাদপত্রেই এ কথা ব্যক্ত হইতেছে, লোকের মুখে মুখে এ কথা ঘুরিতেছে ; তথাকথিত ঋণের একটা তালিকাও দেওয়া হইয়াছে।

"কাজেই যতশীঘ্র সম্ভব আমাকে প্রতিবাদ করিতে হইল। বলিতে হইল, আমার সম্মতি লওয়া ত দূরের কথা, এ প্রস্তাব করিবার পূর্বে আমাকে একবার জানানোও হয় নাই। আমি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অবিজ্ঞাত। বলিতে হইল, না জানিয়া শুনিয়া যে ৪৫ হাজার টাকা ঋণের কথা কথিত হইয়াছে প্রকৃতপক্ষে ঋণ তাহার অর্দ্ধাংশেরও অনেক অল্প ; আর এই ঋণ শোধের নিমিত্ত সাধারণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিবার ইচ্ছা আমার কখনই নাই।···

"···৬০টি বিধবাবিবাহে ৮২ হাজার টাকা খরচ হইয়াছে। শুনিলাম এজন্য কেহ কেহ বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা হিন্দুসমাজের অবস্থা জানেন, এক দলাদলির জন্যই এ পক্ষে কত অধিক টাকা ব্যয় হইতে পারে, তাহা বোধকরি তাঁহাদের অজ্ঞাত নহে। মফঃস্বলের যে সকল গ্রামে বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহার অনেক স্থলেই

এইরূপ দলাদলি। সুতরাং সহজেই প্রতীতি হইতেছে, এরূপস্থলের বিবাহ অবশ্যই কিছু ব্যয়সাপেক্ষ।

"প্রথম বিধবাবিবাহের অনুষ্ঠান হয় কলিকাতা সহরে। এই প্রথম বিবাহে একটু ধুমধাম করা এবং পণ্ডিত কুলীনাদির বিদায়াদি দেওয়া সংস্কার-সমিতির সভ্যগণের মতে প্রয়োজনীয় বোধ হয়। তাই বহু কুলীন ব্রাহ্মণাদি এ বিবাহে আহূত হইয়াছিলেন, এবং বিদায়াদিও তাঁহাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল। শুদ্ধ এই একটি বিবাহেই দশ সহস্র টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল।

"আমার সম্বন্ধে লোকে কিছু ভাবিবে বা আমাকে লোকে কেহ কিছু বলিবে—এই ভয়ে আমি এই সকল কথা বলিতেছি না। বলিতেছি, এই বিধবাবিবাহ সংস্কার কার্য্যে ইহা অনুকূল হইবে বলিয়া।

"·যাঁহারা এই চাঁদা তুলিবার প্রস্তাব করিয়াছেন এবং বিধবাবিবাহ ফাণ্ড্ খুলিবার সংকল্প করিয়াছেন তাঁহারা যদি আমার এই ঋণের কথা না পাড়িতেন, তাহা হইলে আমি প্রতিবাদ করা আবশ্যক বলিয়া বোধ করিতাম না। কেননা পূর্বেই বলিয়াছি, আমি যাহা ঋণ করিয়াছি, তাহা শোধ করিবার জন্য সাধারণ সমাপে আবেদন করিবার ইচ্ছা আমার লেশমাত্রও নাই। তাই আমি উক্ত প্রচারিত প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিতেছি। এবং যে সকল ভদ্রলোক এই প্রস্তাবে স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে সরিয়া দাঁড়াইতে অনুরোধ করিতেছি। ইতি ২৬শে জুন, ১৮৬৭ খৃঃ।

স্বাঃ ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা"

[বিহারীলাল সরকার : পৃঃ ৪৩৮—৪১]

বিদ্যাসাগর তাঁর ঋণের পরিমাণ অন্যকে জানাতে চাননি।

শিক্ষাবিস্তারের জন্য বিদ্যাসাগরের দান সম্ভবতঃ অন্যান্য ক্ষেত্রকে অতিক্রম করে গিয়েছিল। ইন্‌স্‌পেক্টর অব্ স্কুলস্ হয়ে থাকার সময় তিনি যে ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন, গভর্নমেন্ট্ সেগুলির ভার বহন করতে অস্বীকার করলে সে ভার বিদ্যাসাগর নিজের হাতে তুলে নেন। বীরসিংহ গ্রামে ভগবতী বালিকা বিদ্যালয় ও অন্যান্য বহু জায়গায় বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য তিনি অজস্র টাকা দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় দান এবং কীর্তি মেট্রোপলিটান কলেজ স্থাপনে। মেট্রো-

পলিটান ইনস্টিটিউসন ও কলেজ পরিচালনার জন্য যখন যে টাকার প্রয়োজন হয়েছে তিনি দিয়েছেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে কলেজের অধ্যক্ষ সূর্যকুমার অধিকারীর চেষ্টায় শঙ্কর ঘোষ লেনে কলেজের নতুন ভবন তৈরি হলো। এই ভবন নির্মাণের জন্য সমস্ত টাকাই বিদ্যাসাগর ধার করে যোগাড় করেছিলেন। সুবলচন্দ্র মিত্র তাঁর গ্রন্থে C. E. Buckland-এর মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। ব্যাক্‌ল্যাণ্ড লিখেছেন—

"The magnificent building of the Metropolitan Institution was erected by him at a cost of a lakh and a half of rupees : the expenditure was primarily incurred at his own cost..."

বিহারীলাল এই প্রসঙ্গে লিখেছেন—"...১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে শঙ্কর ঘোষের লেনে নূতন বাড়ীতে কলেজ ও স্কুল প্রবেশ করে। জমী ক্রয় করিতে ও বাড়ী নির্মাণ করিতে প্রায় দেড়লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। প্রায় লক্ষটাকা ধার হইয়াছিল।"

বিদ্যাসাগর বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে ঋণ গ্রহণ করেছেন। যাঁরা ঋণ দিতেন তাঁরা জানতেন কেন বিদ্যাসাগরের এই ঋণের প্রয়োজন। তাঁর ওপর এ বিশ্বাস তাঁদের ছিল যে, বিদ্যাসাগর প্রত্যেকটি ঋণ সুদ সমেত শোধ করে যাবেন। তাঁদের এ অনুমান অমূলক ছিল না, সেকথা আগেই বলেছি। তবে যে সকল ব্যক্তি সেদিন নিঃসংশয়ে বিদ্যাসাগরের হাতে টাকা তুলে দিয়েছেন তাঁদের কথা আমরা সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্মরণ করি।

বেশীর ভাগ সময়ে বিদ্যাসাগরের মুখের কথায় অথবা তাঁর লেখা একটি চিঠির বিনিময়েই টাকা এসেছে। কিন্তু কোন সময়ে তাঁকে ব্যক্তিগত মুচলেকা দিতে হয়েছে। এমনকি দলিল সই করে আদালতে রেজিস্ট্রি করাতে হয়েছে। এমনই একটি দলিলের খোঁজ সম্প্রতি পাওয়া গেছে। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালায় রক্ষিত এই দলিলটি ভাগ্যকুলের জমিদার শ্রীনাথ রায়ের অনুকূলে লেখা। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের ৫ তারিখে রেজিস্টার্ড। এই দলিলের বলে বিদ্যাসাগর অথবা তাঁর জামাতা ও কলেজের অধ্যক্ষ সূর্যকুমার অধিকারী যে কোন সময়ে উক্ত জমিদারের কাছ থেকে টাকা নিতে পারতেন এবং জমা দিতেও পারতেন। অর্থাৎ হিসাবটা ব্যাঙ্কের ওভারড্রাফ্‌ট্

এ্যাকাউন্টের মত ছিল। মনে হয় মেট্রোপলিটান কলেজের খরচ চালানোর ও কলেজ ভবনের জন্য যে দেনা হয়েছিল, সেই দেনা শোধ করার প্রয়োজনেই এই এ্যাকাউন্টটি খোলা হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের স্বাক্ষরিত এবং সূর্যকুমার অধিকারীর হস্তলিখিত এই দলিলটা অন্য কোথাও প্রকাশিত হয়নি। তাই পুরো দলিলটিই উদ্ধৃত করছি।

শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ রায়
পিতা ৺প্রেমচাঁদ রায়
সাকিম ভাগ্যকুল, ষ্টেশন শ্রীনগর
জেলা ঢাকা, জাতি তিসিব্যবসায়,
জমিদারী ও তেজারতি,
নিমিত্তং শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
পিতা ৺ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
সাকিম বাদুড়বাগান, সহর কলিকাতা
জাতি ব্রাহ্মণ

ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

কস্য মর্টগেজলিখিতং কার্য্যঞ্চাগে কলেজ ও স্কুলবাটি প্রস্তুত করিবার জন্য সময় সময় আমার টাকা কর্জ্জ লওয়া আবশ্যক হওয়ায় আপনার সহর কলিকাতা হাটখোলা মোকামের তহবিল হইতে আমার নামে খাতায় খরচ লিখাইয়া ও আমার স্বয়ং দস্তখত হাতচিঠায় লিখিয়া দিয়া ৩০,০০০ ত্রিশহাজার টাকা পর্য্যন্ত আমার দেনা ও পাওনার পাওনা থাকে এইরূপ লেনদেন করা স্থির করিয়া সন ১২৯৩ সালের ১১ ফাল্গুন তারিখ হইতে আমার নামে যে হাতচিঠা হইয়াছে ঐ হাতচিঠার লিখিত ৫০০০৲ পাঁচহাজার টাকা সমেত ৩০,০০০ ত্রিশহাজার টাকা পর্য্যন্ত ও তাহার সুদ আদায়ের মাতবরি জন্য আমার নিম্ন তপশীলের লিখিত সম্পত্তিসকল অর্থাৎ শঙ্কর ঘোষের লেনস্থ কমবেশ ১৸১ একবিঘা এগার কাঠা জমী আর তদুপরিস্থিত তেতলা বিল্ডিং দুখানি ও পরে উহার উপরে আর যে কিছু ইমারত হইবে সে সমস্ত উক্ত ৩০,০০০ ত্রিশহাজার টাকা অথবা যখন যে টাকা লইব তাহার সুদ লওয়ার তারিখ হইতে আদায় পর্য্যন্ত বার্ষিক ফি শতটাকার ৭৷৷০ সাড়ে সাতটাকার হিসাবে দিব

এবং সুদ বাদে আসল মধ্যে যখন যে টাকা আদায় দিব তাহার সুদ আদায়ের তারিখ হইতে মিনাছি পাইব। যে টাকা যখন কর্জ লইব তাহা আমি স্বয়ং অথবা আমার জামাতা শ্রীমান সূর্য্যকুমার অধিকারী আমার নাম বকলম দরখাস্ত করিয়া হাতচিঠায় লিখিয়া দিয়া কর্জ লইব ও যখন যাহা আদায় দিব তাহা ঐরূপ হাতচিঠায় লিখিয়া দিব ও বাঙ্গালা প্রত্যেক সনের শেষভাগে উক্তরূপে সুদের যে টাকা বাকি থাকিবেক তাহা তৎ সময়ে পরিশোধ না হইলে পর বৎসরের ১লা বৈশাখ হইতে আসল সামিলে গণ্য হইবেক ও ঐ নিয়মে তাহার সুদ চলিতে থাকিবেক ও ঐ সকল টাকা হাতচিঠায় তুলিয়া দিয়া হাতচিঠা পরিবর্তন হইতে পারিবেক এবং উক্তরূপে আপনার মায়সুদ যে টাকা পাওনা হইবে তাহা সমুদায় আপনি চাইবামাত্র আদায় করিয়া রীতিমত হাতচিঠা ও এই দলিল ফেরত লইব। আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে উক্তরূপে কারবার করিবাৰ নিমিত্ত মবলগ ৩০,০০০ ত্রিশহাজার টাকা পর্য্যন্ত কিম্বা তাহার কম যত টাকা লইব হাতচিঠা মাফিক সেই টাকা ও তাহার সুদের জন্য স্থাবর সম্পত্তি যাহা আপনার নিকট এতদ্বারা মর্টগেজ রাখিলাম এই আমার নিম্ন তপশীলের লিখিত মর্টগেজের রিকনভেয়ান্‌স্ না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ ৩০,০০০ ত্রিশহাজার টাকা পর্য্যন্ত কিম্বা তাহার কম যত টাকা লইব হাতচিঠা মাফিক সেই টাকা ও তাহার সুদের টাকার জন্য এই সম্পত্তি আপনার নিকট দায়ী থাকিবেক। কারবারের সুবিধানুযায়ী কখনও উক্ত হাতচিঠায় ৩০,০০০ ত্রিশহাজার টাকার কম দেনা হইলে কি হাতচিঠায় দেনা একেবারে শোধ হইলে কি পুনঃ দেনা আরও হইলে ঐ সম্পত্তির প্রতি ৩০,০০০ ত্রিশহাজার টাকা পর্য্যন্ত দায়িত্বে পুনর্বার হাতচিঠায় লেনদেন করিতে পারিব। এতদ্বারা আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে উপরি উক্ত হাতচিঠার লিখিত দেনা টাকা আপনার তলব মত আদায় না করিলে আপনার মায়সুদ হাতচিঠা-মোতাবেক পাওনা সমস্ত টাকার দাবিতে আমার নামে নালিশ ও ডিক্রী করত আইনমত আবদ্ধীয় সম্পত্তি নিলাম বিক্রয়ের দ্বারা আপনার হাতচিঠা মোকাবেলা পাওনা মায়সুদ ও খরচ সমস্ত টাকা আদায় করিয়া লইবেন ও তদ্দারা সমস্ত টাকা আদায় না হইলে আমার অপর স্বনামী বিনামী সম্পত্তি দ্বারা বাকী টাকা আদায় করিতে ক্ষমবান

হইবেন এবং সমস্ত টাকা পরিশোধ না হওয়া পর্য্যন্ত বার্ষিক শতকরা ৭৷৷৹ সাড়ে সাতটাকার হিসাবে সুদ পাইবেন। আপনার পাওনা সমস্ত টাকা আদায় করিয়া এই মর্টগেজ খালাস না হওয়া পর্য্যন্ত আবদ্ধীয সম্পত্তি কোনরূপ হস্তান্তর ও দাযসংযোগ ও কোন লভ্য হস্তারক কোন কার্য্য করিতে পারিব না এবং ইত্যগ্রেও তাহা কাহাকে হস্তান্তর ও দায়সংযোগ করি নাই তাহাতে আমার নির্ব্যূঢস্বত্ব ও অধিকার আছে। উপরের লিখিত সর্ত্তসকল আমার ও আমার অভাবে আমার ওযারিসানের স্বীকার কেহ তাহার অন্যথা কোন কার্য্য করিব না ও তাহার অন্যথায কেহ কোন কার্য্য করিলেও তাহা গ্রাহ্য হইবে না। এতদর্থে এই মর্টগেজ লিখিয়া দিলাম ও আবদ্ধীয সম্পত্তি সম্বন্ধীয নিম্নলিখিত দলিলাত আপনার নিকট রাখিলাম। ইতি সন ১২৯৩ সাল তারিখ ২৮ ফাল্গুন।

তপশীল সম্পত্তি

প্রেমিসেস নং ২২ শঙ্কর ঘোষের লেন কমবেশ ১৷৷১ একবিঘা এগারকাঠা জমী মায তদুপরিস্থিত তেতলা বিল্ডিং দুখানি হোল্ডিং নং ৩৮৩ ব্লক নং ১৪ নর্থ ডিবিসন। ইহার চৌহদ্দী উত্তর মহেন্দ্র নারাযণ দাসের জমী, পূর্ব ত্রৈলক্যনাথ মিত্রের বাটি ও মহেন্দ্রনারায়ণ দাসের জমী, দক্ষিণ শঙ্কর ঘোষের লেন পশ্চিম মিউনিসিপ্যালিটির ড্রেন ভরাট করা নূতন গলি।

তপশীল দলিল

কন্‌ভেয়ান্‌স্‌ ডিড নং ২৩৮৬ তারিখ ১৪ আগষ্ট ১৮৮৫ একখানি।

	ইসাদী	ইসাদী
Nilmani	লেখক শ্রীসূর্য্যকুমার	শ্রীঅমরচাঁদ
Mitter	অধিকারী	পান
Tala	৬নং রঘুনাথ চাটুজ্যের	হাটখোলা
Suburbs	লেন	
Calcutta	কলিকাতা	

এই দলিলে যে ঘটনাগুলির উল্লেখ পাওয়া যায় তা হলো—

১। শ্রীনাথ রায়ের কাছ থেকে প্রয়োজন মত হাতচিঠা দিয়ে বিদ্যাসাগর টাকা নিতেন আবার শোধ করতেন,

২। বিশেষভাবে কলেজের খরচ ও কলেজভবন নির্মাণের জন্যই তিনি এইভাবে টাকা নিতেন,

৩। এই দলিলটি সই করেন কলেজভবন নির্মিত হওয়ার পর এবং দলিলে তাঁর সম্পত্তিস্বরূপ কলেজের জমী ও ভবন দুই-ই বন্ধক রাখেন,

৪। বিদ্যাসাগর নিজে অথবা তাঁর জামাতা সূর্যকুমার এই দুজনের মধ্যে যে কেউ হাতচিঠা দিয়ে টাকা নিতে পারতেন, বা টাকা শোধ করে হাতচিঠা ফেরত নিতে পারতেন।

৫। কলেজ ও কলেজভবন বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল, সম্পত্তির উল্লেখ করে বিদ্যাসাগর নিজেই ঘোষণা করছেন—'তাহাতে আমার নির্ব্যূঢ় স্বত্ব ও অধিকার আছে।' দলিলটিতে বিদ্যাসাগর তাঁর ব্যক্তিগত সামর্থ্যেই সই করেছেন, কলেজের কর্ণধার হিসাবে নয়। তপশীল সম্পত্তির মধ্যে দেখানো হয়েছে—একবিঘা এগারকাঠা জমি মায় তদুপরিস্থিত তেতলা বিল্ডিং ইত্যাদি। এবং দলিলে বিদ্যাসাগর বলেছেন —'আমার নিম্ন তপশীলের লিখিত স্থাবর সম্পত্তি ··ইত্যাদি'।

জীবনাদর্শ

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮২০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে। তাঁর মৃত্যুর (২৯শে জুলাই ১৮৯১) পর কয়েক যুগ অতিবাহিত হয়েছে। বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে আমাদের মনে কোনো উচ্ছ্বাস থেকে থাকলে এই দীর্ঘ দিনের ব্যবধান মনের সে উচ্ছ্বাসকে মুছে দেওয়ার জন্যে যথেষ্ট। বিদ্যাসাগর শুধু একটা নাম নয়, জাতীয় চরিত্র ও একটি যুগাদর্শের পরিচয়। এই স্মরণীয় চরিত্রের আদর্শ নিয়ে আলোচনা করতে বসলে এখনও বিস্ময়বোধ হয় এই ভেবে যে, এই মানুষটির অজেয় চরিত্রে তৎকালীন যুগের কোনো প্রভাব সক্রিয় ছিল না। সে যুগের বাংলাদেশ বিদ্যাসাগরের চরিত্রাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিল—এমন কথা মনে করবারও কোনো কারণ নেই। সমাজের ইতিহাসে এই ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব যেমন আকস্মিক, তাঁর চরিত্রের দুর্লভ দৃঢ়তাও তেমনি অসাধারণ।

মানুষের চরিত্র কখনও পরিবেশকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে, কখনও পরিবেশকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে এক অনন্যস্বাতন্ত্র্যে সৃষ্ট হয়। বিদ্যাসাগর নিজে যে পরিবারে জাত ও লালিত, তারই মধ্যে ছিল হিন্দু সামাজিক ব্যবস্থার বনিয়াদ। উচ্চবর্ণের গৌরব, ব্রহ্মণ্য তেজ, সংস্কৃত সাহিত্যে পাণ্ডিত্য এবং ঐতিহ্যের সংস্কার সহজাত কবচকুণ্ডলের মতোই তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন। কিন্তু দাঁড়িয়েছিলেন সম্পূর্ণ আপন পৌরুষে ভর করে। তিনি যে সময়ে সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নরত, সেই সময়েই পাশাপাশি হিন্দু কলেজে ডিরোজিও-র নব্যবঙ্গ দলের অত্যুগ্র ইংরেজিয়ানা ও স্বধর্মবিদ্বেষী আন্দোলন। কিন্তু সেই আধুনিকতার উগ্র ঢেউও তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। পরবর্তীকালে

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও তত্ত্ববোধিনী সভার সান্নিধ্যে এসেও তিনি ব্রাহ্ম ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হননি।

তাঁর প্রগতির পদক্ষেপগুলিকে সস্নেহে উপেক্ষা করে যাঁরা তাঁকে শুধু বিদ্যাসাগর এবং করুণাসাগর বলে চিহ্নিত করেছেন, তাঁরা যেমন বিদ্যাসাগর চরিত্রকে ভুল বুঝেছেন, তেমনি বিদ্যাসাগরের হৃদয়ে মানবিকতার বিকাশ না দেখে এবং তাঁর ঐতিহ্যনিষ্ঠা ও প্রাচীনের প্রতি শ্রদ্ধাকে না জেনে শুধু বিদ্রোহী সমাজসংস্কারক ও আধুনিক ইংরাজী মনোভাবাপন্ন একজন শিক্ষাব্রতী হিসাবে বর্ণনা করে যাঁরা জীবনী লিখেছেন, তাঁরাও তেমনি ভুল করেছেন। বিদ্যাসাগরকে 'কাকের বাসায় কোকিলের ডিম' বলে যিনি বিশেষিত করেছিলেন তিনিও কিন্তু তাঁকে 'অ-ভারতীয়' আখ্যায় চিহ্নিত করতে চাননি। অথচ এ কথাও সত্য যে, পুরনো কাঠামোতে সম্পূর্ণ নতুন, অনন্য-স্বতন্ত্র এক চরিত্রের স্রষ্টা ছিলেন বিদ্যাসাগর। চরিত্রবলে একক স্তম্ভের মতো গোটা হিন্দু সমাজের ভিতটাকে কাঁধের ওপর তুলে ধরেছিলেন তিনি।

জীবনের প্রারম্ভ থেকেই চরিত্রের যে রূপটা তাঁর মধ্যে স্পষ্ট প্রস্ফুট হয়েছিল সে হলো তাঁর অদম্য জেদ। বালক বিদ্যাসাগরের জেদ তাঁর মা বাবা এমন কি প্রতিবেশীদেরও ব্যস্ত করে তুলেছিল। ঈশ্বর যেদিন স্নান করতে চান না, সেদিন কেউ তাঁকে স্নান করাতে পারেন না। পিতার নিষ্ঠুর প্রহারেও তিনি অবিচল। চরিত্রের এই অদম্যতাই ভবিষ্যৎ জীবনে তাঁকে পৌরুষের পাশুপত অস্ত্র দান করেছিল। তাঁর জীবনীতে পড়া যায়, সারারাত ধরে লিখে গোটা একটা বই নকল করে ফেলেছেন। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের মতো দুরূহ গ্রন্থকে সহজ উপক্রমণিকায় রূপান্তরিত করেছেন মাত্র কয়েক দিনের চেষ্টায়। শিক্ষার ক্ষেত্রকে উদার ও প্রসারিত করতে হবে এ ছিল তাঁর সংকল্প; এবং এই সংকল্প সাধনের জন্য জীবন পণ করেছেন। যেদিন অনুভব করেছেন, এই সমাজে নারীকে কি দুঃসহ ক্লেশ ও যন্ত্রণাভোগ করতে হয়, সেদিন থেকেই সমাজের ঘুণধরা সংস্কারের বেড়া ভাঙবার জন্য ঐরাবতের মতো এগিয়ে গেছেন। অকৃতজ্ঞতা তাঁকে দুঃখ দিয়েছে, হতাশা ক্লান্ত করেছে, আঘাত করেছে জর্জরিত—কিন্তু

কোনো বাধাই তাঁকে নিষ্ক্রিয় করতে পারেনি। ব্যর্থতা বোধ করে সংগ্রামে বিরতি দিয়েছেন, এমন ঘটনা তাঁর জীবনে নেই।

বিদ্যাসাগরের এই অদম্য কর্মপ্রচেষ্টার মূলে ছিল একটি সুসংহত ও মানবপ্রেমী মনের প্রকাশ। সংস্কৃত কলেজের সকল শিক্ষায় পরিশুদ্ধ যাঁর মন, তাঁর মধ্যে স্বার্থচিন্তার কোনো প্রকাশ কোনোদিনই দেখা যায়নি। বরং সমষ্টির প্রয়োজনে আপনাকে তিনি অবলুপ্ত করতে পারতেন। ছাত্রজীবনের একদিনের কথা ধরা যাক। তখন ঠাকুরদাস, ঈশ্বরচন্দ্র ও তাঁর একটি ভাই একত্রে থাকতেন। সারাদিন অভুক্ত থাকার পর একদিন সন্ধ্যায় তাঁরা খেতে বসেছেন। ঈশ্বর তাঁর ভাতের গ্রাসের মধ্যে একটি আরশোলা পেলেন। পাছে অন্যদের খাওয়া নষ্ট হয়ে যায় তাই ঈশ্বর সেই আরশোলাটিকে পাতের পাশে ফেলতেও সাহস পেলেন না। আরশোলাসমেত সেই ভাত গিলে খেয়ে ফেললেন।

ঘটনাটি হয়ত বড় করে দেখাবার মতো কিছু নয়, তবু এই একটি ঘটনাতেই চরিত্রের যে স্ফুরণ দেখা গেল তার দ্বারা তাঁর মানসিক গঠনকে বোঝা সহজ হবে। পরবর্তী জীবনেও সমাজ ও সমাজের মানুষের স্বার্থে জীবনের সবটুকু গরল তিনি একাই গলাধঃকরণ করেছিলেন।

যা ভালো মনে করেছেন, তাকেই তিনি কাজে রূপান্তরিত করতে চেয়েছেন। এই ভালো মনে করার কষ্টিপাথর ছিল মানুষের প্রতি স্বজনপ্রীতি। অর্থাৎ তাঁর এই জেদের মূলে তোগলকী খামখেয়ালিতা ছিল না। মানবিকতার অনুভব থেকেই সঞ্জাত তাঁর কর্তব্য-চেতনা। সে চেতনা অগ্রসরমূলক ও আপোসচিন্তাহীন। শৈশবে গ্রামের এক বিধবা বালিকার ব্যথা তাঁকে নিগূঢ়ভাবে পীড়িত করেছে এবং তিনি অনুভব করেছেন সামাজিক যূপকাষ্ঠে আবদ্ধ নারীজাতির অসহায়তা। তাই যে মুহূর্তে তিনি সংকল্প নিলেন যে, বিধবাবিবাহকে আইনসম্মত করতে হবে সেই মুহূর্তেই তিনি শেষ ধাপ পর্যন্ত এগিয়ে গেছেন। চিন্তাকে কাজে রূপায়িত করার পথে কোনো বাধাকেই তিনি বাধা মনে করতেন না। 'আমি যা ভালো মনে করেছি তা আমি করবোই। তুমি সঙ্গে আসো ভালো কথা, না আসো ক্ষতি নেই, আমি একাই যাবো।'—এই ছিল তাঁর বক্তব্য। এই অনমনীয় দৃঢ় ও বলিষ্ঠ মতবাদ সেদিনের বাঙালী সমাজে সম্পূর্ণ অভিনব। এই মনোভাব যে সর্ব-

ক্ষেত্রেই সুফলপ্রসূ হবে তা নাও হতে পারে, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে এর প্রয়োজন ছিল। আদর্শ নায়কের মতো বিদ্যাসাগর ইতিহাস-সচেতন ছিলেন। তিনি অভিজ্ঞ চিকিৎসকের মতো হাতে ছুরি নিয়ে এগিয়েছেন এবং সমাজদেহে অস্ত্রোপচার করে শরীরের অপ্রয়োজনীয় দূষিত অংশ মমতাশূন্য হয়ে বর্জন করেছেন। তিনি জানতেন তাকে কি করতে হবে এবং তাঁর প্রতিকূলতার রূপ কি ব্যাপক। তিনি আরও জানতেন যে, জীবনের আয়ু পরিমিত; এই পরিমিত সময়ের মধ্যেই তাঁর কাজ সমাপ্ত করতে হবে। তাই বিরুদ্ধ যুক্তিতে কান দেওয়ার মতো সময় তাঁর হাতে ছিল না। এমন কি বিপক্ষের মতবাদকে শ্রদ্ধার সঙ্গে বিচার করবার মতো প্রয়োজনও তিনি বোধ করেননি। তিনি চাননি যে, কাজের গতি বিন্দুমাত্র বিলম্বিত হোক। কথার চেয়ে যুক্তি ও আদর্শের প্রচারের চেয়ে কাজের সাফল্যের দাম তাঁর কাছে অনেক বেশী ছিল। তাই যেখানে অন্যের সমর্থন আসেনি সেখানেই তিনি একক, কিন্তু চলিষ্ণু। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—'যেন সৈন্যহীন বিদ্রোহীর মতো তাঁর চতুর্দিককে অবজ্ঞা করিয়া জীবনরণরঙ্গভূমির প্রান্ত পর্যন্ত জয়ধ্বজা নিজের স্কন্ধে একাকী বহন করিয়া লইয়া গেছেন।'

চরিত্রের এই অনন্য-নির্ভর রূপ তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত। চিন্তায় যে আত্মবোধহীন, মানবকল্যাণমুখী অনুভব ছিল, তার দ্বারাই তিনি সকল ক্ষুদ্রতাকে অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। এই সমগ্রচিন্তা ও কল্যাণচিন্তা তাঁকে ব্যক্তিগত সুনাম ও দুর্নামের বোধের বাইরে নিয়ে গেছে। শেষ বয়সে দ্বারকানাথ মিত্র, তারানাথ তর্কবাচস্পতি ও অন্য এগারোজন জুরির মতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে পতিতানারীর পক্ষ সমর্থন করেছেন; এবং স্বামীর সম্পত্তিতে তাঁর উত্তরাধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন। সেদিনও দেশের লোকের নিন্দা ও বন্ধুদের ধিক্কার তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি।

অথচ তিনি ছিলেন করুণাসাগর। চরিত্রের এই পরস্পরবিরোধী রূপকে কবি একটি কথায় ব্যক্ত করেছেন—

'সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয়।'

অগ্নি তো বটেই। সে অগ্নি শুধু বিপক্ষকেই দগ্ধ করেনি, তার দাহ

তাঁর নিজের হৃদয়কেও পুড়িয়েছে। কঠোর কর্তব্যচেতনা তাঁকে এমনই দৃঢ় করেছে যে, আদর্শের সঙ্গে আপোসের গোঁজামিল তাঁকে দিতে হয়নি। তিনি ছেড়ে এসেছেন সরকারী চাকুরি, পরিত্যাগ করেছেন ভবিষ্যতের সমস্ত কিছু সম্ভাবনা। আত্মীয়রা তাঁকে ত্যাগ করেছে, বন্ধুরা গালি দিয়েছে, তিনি অবিচল। ওয়ার্ড্‌স্‌ ইনস্টিটিউসন থেকে বেরিয়ে এসেছেন, হিন্দু এ্যান্যুয়িটি ফাণ্ড থেকেও। একমাত্র পুত্রের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ ঘটেছে। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তেও তাকে ক্ষমা করে যাননি। সেই নিদারুণ যন্ত্রণাবোধে তিনি নীলকণ্ঠ। মানবিক-দায়িত্ববোধের প্রেরণা যখন তাঁর চেতনায় সঞ্জাত, তখন তিনি অবিচল, লৌহকাঠিন্যে স্থির, নীলকণ্ঠ। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে প্রাত্যহিক পৃথিবীর সংস্পর্শে যখন এসেছেন, তখন তাঁর হৃদয় করুণানির্ঝর। আসলে যে প্রেম তাঁকে বিগলিত করেছে, সেই প্রেমই তাঁকে করেছে কঠোর। কারণ তিনি জেনেছিলেন যে, করুণার সঙ্গে বীর্যের মিশ্রণ না হলে সে করুণা অন্যায় ও নিপীড়নকে রোধ করতে পারে না। তাই কর্তব্যকঠোর মানুষটির হৃদয় বেদনায় সতত বিগলিত। যখন তিনি দাতা তখন তাঁর বিচারবোধও বিলুপ্ত। ইউরোপীয় আধুনিকতায় প্রার্থীকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে তিনি কখনই পারেননি।

বিদ্যাসাগরের দয়ার্দ্র হৃদয়ের পরিচয় দিতে গিয়ে তাঁর জীবনীকার সুবলচন্দ্র মিত্র লিখেছেন—'কোথাও যাতায়াত করিতে হইলে বিদ্যাসাগর পালকির আশ্রয় নিতেন। পথে যখনই কোনো দুর্বল বা রোগগ্রস্ত লোক তাঁহার চোখে পড়িত, তিনি নিজে নামিয়া আসিয়া তাহাকে পালকিতে তুলিয়া লইতেন। তিনি সর্বদাই সঙ্গে যথেষ্ট টাকাপয়সা রাখিতেন। কোনো দুঃস্থ লোক প্রার্থী হইলে তিনি তাহাকে কিছু না কিছু দিতেনই। He never sent away any beggar displeased.'

তাঁর কাছে আসবারও প্রয়োজন ছিল না। কোনরকমে কানে পৌঁছলেই হলো যে কেউ অভাবে কষ্ট পাচ্ছে। বিদ্যাসাগর যে ভাবেই হোক তাকে সাহায্য দেবেনই। অজস্র দরিদ্র ছাত্রকে তিনি প্রতিপালন করেছেন। তাঁর বীরসিংহ ও কলকাতার বাসভবনে প্রতিদিন একশ' লোকের পাতা পড়ত। তাঁর দানের মধ্যে বিচার যেমন ছিল না, তেমনি ধর্মভেদও ছিল না। এক মুসলমান ভিখিরী প্রতিদিন তাঁকে গান শুনিয়ে

ভিক্ষা নিয়ে যেতো। একবার সেই ভিখিরীটির ঘর পুড়ে গেলে বিদ্যাসাগর তাকে নতুন ঘর তুলে দেন। তাঁর দানের ক্ষেত্র বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। একবার মেদিনীপুরের এক জমিদারের পুত্ররা তাঁর কাছে প্রার্থী হয়। তাদের স্বর্গত পিতা শিবনারায়ণ চৌধুরী জনৈক ব্যক্তির কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা ঋণগ্রহণ করেছিলেন। সুদে আসলে সে ঋণের পরিমাণ পঁচাত্তর হাজারে পৌঁছায়, এবং জমিদারি নিলামে ওঠে। বিদ্যাসাগর ঋণ করে সেই টাকা সংগ্রহ করেন, এবং অসহায় নাবালকদের সম্পত্তি রক্ষা করেন। বর্ধমানে (১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে) যখন ম্যালেরিয়ার প্রকোপ মহামারি আকার ধারণ করেছিল তখন বিদ্যাসাগর বর্ধমানে গিয়ে বাড়ীভাড়া নিয়ে রইলেন পীড়িত ও অসুস্থদের সেবার জন্য।

মানুষের সেবার জন্য তিনি উৎসর্গ করেছিলেন নিজেকে। কিন্তু আগেই বলেছি, তাঁর হৃদয়ের করুণাধারার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সক্রিয় বীর্যের। তিনি শুধু যে শোষিত নির্যাতিত ও বঞ্চিত মানবতার দুঃখে দ্রবীভূত হয়েছিলেন তাই নয়, তিনি অঙ্গীকার করেছিলেন, এই বৈষম্য, অন্যায় ও পীড়নের কারণগুলিকে উচ্ছেদ করবেন। এই শপথবদ্ধ মনই তাঁকে আজীবন সংগ্রামের প্রেরণা দিয়েছে। তিনি দেখেছেন সমাজ ও সংস্কারের নির্দয় পীড়নে অসহায় নারীসমাজ হয়েছে নির্যাতিত। তাই অর্জুনের মতো গাণ্ডীব তুলে নিয়েছেন হাতে। বিধবা নারীর জীবন্মৃত অবস্থাকে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন বিধবাবিবাহকে বিধিবদ্ধ ও সমাজসম্মত করতে। সেই প্রতিজ্ঞার মুখে সমাজের সংঘবদ্ধ প্রতিবাদও দাঁড়াতে পারেনি। তাঁর হৃদয়ে করুণাবোধের সঙ্গে সত্যানুভূতির মিলন ঘটেছিল বলেই, শুধু দয়া দিয়ে নয়, শুধু সহানুভূতি আকর্ষণ করে নয়, যুক্তি দিয়ে নয়, বীর্য দিয়ে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অতি-আধুনিক ও সম্প্রসারণশীল হওয়ায় মানবিকতার প্রেরণা তাঁকে যুগনায়কের পদে বৃত করতে পেরেছিল। দৃষ্টির সামনে শুধু একটিমাত্র ঘটনা বা অনুভব নয়, ছিল মানুষের জন্য সমবেদনা, তাই শুধু বিধবাবিবাহের মতো একটি কীর্তিতেই তিনি নিঃশেষ হতে চাননি। তাঁর সমগ্রদৃষ্টি সমাজকে নিঃশেষে ক্লেদমুক্ত করতে চেয়েছে। তাই বহুবিবাহ রোধের প্রচেষ্টা এবং বাল্য-

বিবাহ বন্ধ করার আগ্রহ তাঁর মধ্যে খুব স্বাভাবিক ভাবেই এসেছে। এই সমগ্রদৃষ্টির জন্যেই তিনি পতিতানারীর মানবিক অধিকারকে স্বীকার করতে পেরেছেন এবং শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে সকল বৈষম্যকে দূর করার প্রয়াস পেয়েছেন।

অন্যায়কে অন্যায় বলে ভর্ৎসনা করার জন্যে অনেক বড় বুকের দরকার হয়। যে মানুষ সর্বস্বত্যাগ করার ঝুঁকি নিতে পারে সেও জনমতের বিরুদ্ধে গিয়ে দাঁড়াতে রাজী হয় না। কিন্তু বিদ্যাসাগর এমনই একটি চরিত্র যা জনপ্রিয়তার মোহের অনেক ওপরে আসন পেতেছিল। অপ্রিয় হওয়ার ভয়ে অন্যায়কে অন্যায় বলে ঘোষণা করতে কোনোদিনই দ্বিধা করেননি বিদ্যাসাগর। অসত্যের সঙ্গে সহবসতি চলতে পারে— এমন ধারণা তাঁর কখনও ছিল না। তাঁর সামনে দুটো সোজা পথ ছিল, মাঝামাঝি কোনো পথে কখনও হাঁটেননি। যা ভালো মনে করেছেন তার জন্য জীবন পণ করেছেন ; যেখানে বিন্দুমাত্রও অন্যায় অনুভব করেছেন সে পথ পুরোপুরি পরিহার করেছেন। তাঁর গর্জন সর্বত্রই সোচ্চার, সমান তীব্র।

সে যুগে উচ্চপদস্থ ইংরাজ রাজকর্মচারীদের প্রতাপ প্রচণ্ডরকম ছিল। কিন্তু কোনো দিন কোনো ইংরাজশাসকের ভ্রূকুটিকে নীরবে মেনে নিতে চাননি তিনি। বারবার সংগ্রামে নেমেছেন ; এবং—যা অন্যায় বলে ভেবেছেন তার প্রতিরোধ করেছেন। রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহর মৃত্যুর পর তাঁর নাবালক পুত্রদের জমিদারি তিনি কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্-এর হাতে তুলে দিয়ে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। তদানীন্তন কালেক্টর ও কমিশনার ড্যাম্পিয়ার সাহেব জমিদারি কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্-এর হাতে দেওয়ার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে ছিলেন জেনে বিদ্যাসাগর তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন এবং ছোটলাট সেসিল বিডনকে দিয়ে এ কাজ করান। বর্ধমানে যখন ম্যালেরিয়ার মহামারি শুরু হয় তখন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অবহেলার কথা তিনিই স্যার উইলিয়ম গ্রে'র গোচরে আনেন। অধ্যক্ষ কার-এর মুখের সামনে চটি-শুদ্ধ পা তুলে বসেছিলেন। কারণ কারসাহেব বিদ্যাসাগরের প্রতি অনুরূপ আচরণ দেখিয়েছিলেন। অর্থাৎ যা অন্যায়, তার ভিত্তি যত ওপরেই হোক বিদ্যাসাগর কোনো দিন তার সামনে নতি স্বীকার করেননি। চাকরি গেলে আলু বেচে

জীবন ধারণ করবো—এমন ধারণা সেদিন কোনো বাঙালীর মনে ছিল না; আজও আছে কিনা সন্দেহ। সুনামের মোহ যাঁর নেই, ভবিষ্যতের চিন্তা তাঁর কাছে তুচ্ছ।

সামাজিক অনুশাসনের গ্লানিকে মুছে দিতে তিনি বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন বলেই এ কথা মনে করা ঠিক নয়, যে, গোটা সমাজটাকেই তিনি ভেঙ্গে দিতে চেয়েছিলেন। সমাজের শাসনকে তিনি শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন বলেই, সমাজকে তিনি ক্লেদমুক্ত করতে চেয়েছিলেন। কুসংস্কারকে যিনি নির্মূল করতে চেয়েছেন, ঐতিহ্যকে তিনিই শ্রদ্ধা করেছেন। তাই যে বিদ্যাসাগর বহুবিবাহের নির্মম সমালোচক, যিনি বিধবাবিবাহের প্রবর্তনে আমৃত্যু সংগ্রামী তিনিই হিন্দুধর্মসম্মত বিবাহ-রীতির পরিবর্তন অবাঞ্ছনীয় বলে মনে করেন। মায়ের মৃত্যুর পর বিদ্যাসাগর একবছর হবিষ্যান্ন করেছেন। হিন্দু ব্রাহ্মণের উপযোগী বেশ তিনি কোনো সময়েই ত্যাগ করেননি। লাটসাহেবের (হ্যালিডে) অনুরোধেও তাঁর ধুতি-চাদর ছাড়তে রাজী হননি। তাঁর চটিজুতা ঐতিহাসিক সম্মান পেয়েছে, কারণ তিনিই একমাত্র বাঙালী যিনি পায়ের চটিজোড়াকে ত্যাগ করে এশিয়াটিক সোসাইটিতে প্রবেশ করতে রাজী হননি। সোসাইটির সম্পাদকের একান্ত অনুরোধেও না।

এই ঘটনাগুলিতে তাঁর তীব্র স্বাজাত্যবোধ ও আত্মাভিমান পরিস্ফুট হযেছে। একদিকে প্রকাশ পেয়েছে নেতৃসুলভ আত্মসচেতন ও আত্ম-নির্ভর মনের, অন্যদিকে তাঁর অখণ্ড ও অজেয় পৌরুষের। একদিকে যিনি মনে প্রাণে বিপ্লবী, অন্যদিকে তিনিই ঐতিহ্যের বাহক এবং সংস্কৃতির ধারক।

অথচ রক্ষণশীলতার কোনো চিহ্নই ছিল না তাঁর মধ্যে। যিনি আচারে বেশভূষায় চিরকালের হিন্দু, তিনিই আবার চিন্তায় ও কর্মে চির আধুনিক। বাংলা ভাষাকে শিক্ষার বাহন করার জন্য এবং বাংলা-শিক্ষার পরিধির প্রসারের জন্য যেমন তাঁর অন্তহীন উদ্যোগ, ইংরাজী শিক্ষা ও ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানকে তেমনি তাঁর অকুণ্ঠ আবাহন। শিক্ষাব্রতী হিসেবে গ্রহণ করেছেন প্রাচ্যদর্শনের সঙ্গে পাশ্চাত্যদর্শনের আলোচনা। সংস্কৃতর সঙ্গে বরণ করেছেন ইংরাজী ভাষার ঐশ্বর্য। সংগ্রহ করে এনেছেন ইংরাজী শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে যা কিছু গ্রহণযোগ্য—

সবই। অর্থাৎ রামমোহনের পর বিদ্যাসাগরই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে মিলনের সেতু রচনা করেছেন।

দৃষ্টিভঙ্গির এই আধুনিকতাই বিদ্যাসাগর চরিত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। মন যাঁর সকল সংস্কার থেকে মুক্ত এবং হৃদয় যাঁর মানব-কল্যাণের অভিমুখী, তাঁকে আধুনিক না বললে 'আধুনিক' শব্দের মানে পাল্টাতে হয়। সমাজমানসে অন্ধ দাসত্ববোধকে মুছে দিয়ে যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি। তাঁর প্রসারিত চরিত্র নৈতিক শুচিতা রক্ষার জন্য তত ব্যস্ত ছিল না, যতটা ছিল মানবিক অধিকার রক্ষার জন্য।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবে যাঁরা নেতৃত্ব দেন, তাঁদের পক্ষে প্রয়োজন হয় চিন্তা ও দর্শনকে সকলের সামনে তুলে ধরার। তার জন্য কেউ হন বক্তা—বাগ্মীতায় জনচিত্তকে উত্তাল করে তুলে স্বপরি-কল্পিত পথে চালিত করেন। কেউ হন লেখক। যাঁরা রচনার মধ্য দিয়ে যুগান্তকারী চিন্তাশক্তির প্রকাশ দেন। বুদ্ধি ও বিশ্লেষণের দীপ্তিতে জয় করে নেন জনসাধারণকে। রামমোহন, বিবেকানন্দ, সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথ অথবা আরও পরবর্তীকালে সুভাষচন্দ্র পর্যন্ত দেখা গেছে, সকলেই বাগ্মী এবং লেখক। বিদ্যাসাগর লেখক ছিলেন, কিন্তু সেই লেখার মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করতে আসেননি। তাঁর লেখা নিছক সামাজিক প্রয়োজনে। অর্থাৎ স্কুল ও কলেজের পাঠ্য বই তৈরি করার জন্যে, আর নইলে বিধবাবিবাহ সম্পর্কিত বিতর্কে স্বমতকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে লিখেছেন। কিন্তু কখনও কোনো লেখায় বিদ্যাসাগর বলতে চাননি, কি তাঁর জীবনের আদর্শ। আর সবচেয়ে বড় আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সারাজীবনে বিদ্যাসাগর একটিও বক্তৃতা দেননি। বির্তকে যোগ দিয়েছেন, প্রতিপক্ষকে যুক্তিতে যুক্তিতে পর্যুদস্ত করেছেন, কিন্তু যাকে বলে—জনতার সামনে ভাষণ—তা বিদ্যাসাগর কোনো দিনও দেননি। অথচ উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, সমাজ ও শিক্ষা জগতে তিনিই ছিলেন অবিসংবাদিত নেতা।

স্বল্পভাষী ও কর্মনির্ভর তাঁর চরিত্র। যিনি ধুতি-চাদর ছাড়া পরেন না, তিনি চেয়ার টেবিল ছাড়া বসেন না। নিয়মানুবর্তিতা তাঁর জীবনের সঙ্গী। বহিরঙ্গে যিনি ভারতীয় 'অন্তরে অন্তরে তিনি ইউরোপীয়।

ততটুকুই কথা বলেছেন যতটুকু বলার প্রয়োজন হয়েছে এবং যে কাজ করার প্রয়োজন অনুভব করেছেন সে কাজ করতে বিরত হননি। তাঁর জীবনদর্শন পেতে হলে তাঁর কর্মধারাকেই বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে।

বিদ্যাসাগরের হৃদয় যে মানবমুখী ছিল এবং মানবিক চিন্তাধারাই যে তাঁর সকল কর্মের উৎস এ কথা বুঝতে পারলে বিদ্যাসাগর চরিত্রের অনেকখানি বোঝা যায়। যাঁরা অভিযোগ করেন বিদ্যাসাগর নাস্তিক ছিলেন, তাঁদের অভিযোগ অহেতুক। শাস্ত্রসাগর মন্থন করে বিধবা-বিবাহের সমর্থনে ও বহুবিবাহের বিপক্ষে যুক্তি সংগ্রহ করেছেন বিদ্যাসাগর অথচ সারাজীবনে তিনি একটিবারও ঈশ্বরের কথা আলোচনা করেননি। কখনও কোনো দেবমন্দিরে গেছেন কিংবা কোনো মন্দির-নির্মাণের জন্য টাকা দিয়েছেন এমন কথা শোনা যায়নি। অথচ ঈশ্বরকে অস্বীকার করেছেন এমন প্রমাণও কোথাও নেই। লোকের কৌতূহল উদ্রিক্ত হলে বলেছেন—ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের বস্তু। যার যেমন বিশ্বাস, সে সেইমতো ধর্মপালন করবে।

আড়াই হাজার বছর আগের আর এক মহাবিপ্লবীর জীবনের সঙ্গে বিদ্যাসাগর জীবনের কিছু তুলনা হয়ত টানা যেতে পারে। মৃত্যুর ঠিক পূর্বমুহূর্তে শিষ্য আনন্দের একটি প্রশ্নের উত্তরে তথাগত বুদ্ধ বলেছিলেন —সারাজীবনে আমি কি একবারও বলেছি, ভগবান্ নেই? শিষ্যের আনন্দচকিত বিস্মিত মুখের দিকে চেয়ে আবার তিনি বলেছিলেন—এবং একবারও কি বলেছি, ভগবান্ আছে? অর্থাৎ তথাগতর জীবনে ভগবান্ নিয়ে কোনো প্রশ্ন সৃষ্টি হয়নি। তিনি এমন এক সময়ে জন্ম নিয়েছিলেন যখন ভারতবর্ষে মানুষ বড় অবজ্ঞাত ও অবহেলিত। বৈদিক অনুশাসন ও যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানই প্রধান হয়ে উঠে মানুষের অস্তিত্বকে লুপ্ত করে দিতে বসেছিল। মানবতার সেই অপমানের যুগে আচার ও অনুষ্ঠানের হাত থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে এসেছিলেন বুদ্ধ। তাই তাঁর কাছে মানুষই বড় হয়ে উঠেছিল, ঈশ্বর নয়। অনুরূপ অবস্থারই সৃষ্টি হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে। শাস্ত্রবচনের বিস্তৃত ব্যাখ্যা, লোকাচার, সামাজিক অনুশাসনের নির্দয় পীড়ন ও অনুষ্ঠান-সর্বস্ব হিন্দুধর্মে মানুষ যেন যূপবদ্ধ পশুর মতো হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মানুষের মন থেকে সেই

অন্ধ আচার ও সংস্কারের মোহ যিনি মুছে দিতে এসেছিলেন ঈশ্বরত্ব নিয়ে ধ্যান বা আলোচনা করবার অবকাশ তাঁর ছিল না। বুদ্ধের মতনই তিনি করুণাঘন; তিনি মানবিক অধিকারের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন। বুদ্ধের জীবনাদর্শ (Idealism of Buddha) বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ বলেন—বুদ্ধ ঈশ্বরের অস্তিত্বকে স্বীকার করতেন না, একথা ভাবা অসম্ভব। বিদ্যাসাগরের জীবন ও কর্ম পর্যালোচনা করলেও মনে হয়, তিনি নাস্তিক ছিলেন একথা ভাবা অসঙ্গত। বরং তাঁর অপরিসীম আত্মবিশ্বাসের মূলে ধর্মানুরাগ ছিল এ কথা ভাবাই স্বাভাবিক।

সমগ্র জীবন যাঁর মানুষের ও সমাজের চিন্তায় নিয়োজিত, ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নিঃসঙ্গ ও একক ছিলেন। 'চারিদিকের অসাড়তার মধ্যে এই ব্যথিত বিশাল হৃদয় কেবল নিঃসহায়ভাবে, কেবল আপনার প্রাণের জোরে, কেবল আপনার বেদনার উত্তাপে একাকী আপন কাজ করিয়াছেন।' (রবীন্দ্রনাথ) অর্থাৎ তিনি আপন মননশক্তির জোরে জীবিত ছিলেন। তাঁর মধ্যে দ্বিতীয় চেতনা ছিল—যে চেতনা তাঁকে একদিকে অন্তর্দৃষ্টি অন্যদিকে আত্মনির্ভরতা দিয়েছিল। কিন্তু সাধারণ মানুষের চিন্তার ধারা থেকে তিনি বড় বেশী দূরে ছিলেন। তাই যাদের জন্য তিনি জীবনপাত করেছেন, তারা তাঁকে বুঝতে ভুল করেছে। মানুষের ঔদাসীন্য ও বিরুদ্ধতায় তিনি ক্লান্ত বোধ করেছেন। অকৃতজ্ঞতা তাঁকে বারবার আঘাত করেছে। ব্যর্থতা তাঁকে হতাশা দিয়েছে। শেষ জীবনে যেন কিছুটা নৈরাশ্যবাদী হয়ে উঠেছেন। কঠোর আদর্শবাদ চরিত্রে কিছুটা অসহিষ্ণুতার সৃষ্টি করেছে। চারিদিকের নিস্ফল জীবন-যাত্রার সংগ্রামে তাঁর মন রূঢ় হয়ে উঠেছে। কিন্তু সেই রূঢ় অসহিষ্ণুতায় তাঁর নিজের জীবনই ক্ষতবিক্ষত। জীবনকে ছাড়িয়ে যিনি আপন মননশক্তিতে নির্ভর করতে চেয়েছিলেন, জীবন তাঁকে ক্ষমা করেনি।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা প্রায় বিলুপ্তির পথে চলেছিল। রামগোপাল ঘোষ প্রমুখের নেতৃত্বে ডিরোজিও শিষ্য নব্য বঙ্গের দল একদিকে যেমন ইংরেজিয়ানার দিকে ঝুঁকে পড়েছিল, অন্যদিকে তেমনি মিশনারি পাদরিদের প্রভাবে এবং রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত লোকের প্রেরণায় খৃষ্টধর্মের দিকে সাধারণ মানুষ আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল। এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজের ভাঙ্গা হাল তুলে ধরে আপন নেতৃত্বে তাকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দেবেন্দ্রনাথ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চেয়ে বছর তিনেকের বড় ছিলেন। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠা করলেন তখনও তিনি ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে যুক্ত হননি। তত্ত্ববোধিনী সভার উদ্দেশ্য ছিল "সমুদয় শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব এবং বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার।" অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিই সেদিন এই সভার সভ্য হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

১৮৪৩-এর আগস্ট মাস থেকে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র প্রকাশ। এই পত্রিকার সম্পাদনার ভার দেওয়া হয় অক্ষয়কুমার দত্তকে। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্তর চিন্তাধারায় দেবেন্দ্রনাথের পূর্ণ বিশ্বাস ছিল না। পত্রিকার প্রবন্ধাদি নির্বাচন ও সংশোধনের জন্য দেবেন্দ্রনাথ একটি Paper Committee বা গ্রন্থাধ্যক্ষ সভা গঠিত করেন। এই কমিটিতে ছিলেন শ্রীআনন্দকৃষ্ণ বসু, রাজনারায়ণ বসু, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিরা।

বিদ্যাসাগর কিভাবে এই Paper Committee-তে এলেন, তার

বিবরণ শ্রীসুবলচন্দ্র মিত্র দিয়েছেন। বিদ্যাসাগরের গুণগ্রাহী বন্ধু ছিলেন আনন্দকৃষ্ণ বসু। আনন্দকৃষ্ণ বসু ছিলেন রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের দৌহিত্র। শোভাবাজারের রাজবাড়ীতে বসে আনন্দকৃষ্ণর অনুরোধে বিদ্যাসাগর অক্ষয়কুমারের একটি প্রবন্ধর সংশোধন করে দেন। সংশোধিত অংশ অক্ষয়কুমারের ভাল লাগায় তিনি আনন্দকৃষ্ণর কাছে এসে হাজির হন ও জানতে পারেন বিদ্যাসাগরকে। অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগর, দুজনের বয়সই তখন (১৮৪৩ খৃঃ) তেইশ।

পেপার কমিটির হাতেই ছিল পুরো ক্ষমতা। অর্থাৎ প্রকাশযোগ্য প্রত্যেকটি রচনা, এমন কি সম্পাদকের রচনাও কমিটির অনুমোদন-সাপেক্ষ ছিল। কমিটির অন্যতম সদস্য হিসাবে ঈশ্বরচন্দ্রও অক্ষয়কুমারের রচনাগুলি দেখে দিতেন। এ প্রসঙ্গে শ্রীরাজনারায়ণ বসু তাঁর বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতায় বলেছেন—"অনেকে অবগত নহেন যে, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট অক্ষয়কুমার দত্ত কত উপকৃত আছেন। তাঁহারা তাঁহার লেখা প্রথম প্রথম বিস্তর সংশোধন করিয়া দিতেন।"

এই ঘটনার প্রমাণ পাওয়া যায় শ্রীসুবলচন্দ্র মিত্রের জীবনী গ্রন্থ থেকেই। নিচে যে পত্রাংশগুলি উদ্ধৃত করা হয়েছে তার থেকেই বোঝা যাবে প্রবন্ধ নির্বাচন ও সম্পাদনার ব্যাপারে বিদ্যাসাগর কতখানি প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন। ১৭৭০ শকে অর্থাৎ পত্রিকা প্রকাশের দ্বিতীয় কল্পের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় অক্ষয়কুমার দত্তর একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল; 'কবীরপন্থীদের ইতিহাস'। এই প্রবন্ধটি প্রকাশের পূর্বে বিদ্যাসাগরের কাছে গিয়েছিল অনুমোদনের জন্য।

"I beg to send herewith a copy of an article on the 'History of the Kabirponthis' Please do the needful."

Sd. Akshay Kumar Dutta
Paper-Editor

"I am glad to read the copy sent by you. It has been nicely got up and written in easy, chaste language. I therefore, gladly approve of its publication in the Patrika."

Sd. Isvar Chandra Sarma

"The corrections and alterations made by Iswar Chandra Vidyasagar here and there have been very nice."

Sd. Shyama Charan Mukhopadhya.

এর দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, বিদ্যাসাগরের সাহিত্যিক প্রাধান্য তখনই স্বীকৃত হয়েছিল। এবং অক্ষয়কুমার তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গেই মেনে নিয়েছিলেন।

সে যুগের সাময়িকপত্রের ইতিহাসে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র নাম উজ্জ্বল হয়ে আছে। "একেবারে সূচনাকাল থেকেই সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান পুরাতত্ত্ব জীবনী সমাজনীতি ইত্যাদি নানা বিষয়ে সুসমৃদ্ধ হয়ে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। এই অসাধ্যসাধনের মুখ্য কর্ণধার ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত।" তবুও দেবেন্দ্রনাথ খুশী হতে পারেননি। কারণ তখন তিনি বেদ-বেদান্ত মন্থন করে তত্ত্বান্বেষণে রত। আধ্যাত্মিকতা তাঁর ধর্ম। ভক্তিবাদ তাঁর মনে স্থায়ী আসন নিচ্ছে। তিনি বলেন বেদ ও বেদান্ত অভ্রান্ত এবং প্রার্থনার দ্বারা মানুষের কল্যাণ-ধর্ম সাধিত হবে। অন্যদিকে অক্ষয়কুমার পুরো যুক্তিবাদী। তিনি প্রার্থনায় অবিশ্বাসী। আর ঈশ্বরচন্দ্র? ব্রহ্ম বা ঈশ্বর নিয়ে তার চিন্তা নয়, তার চিন্তা মানুষ নিয়ে।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনীতে এই মতবিরোধের উল্লেখ আছে। [পৃষ্ঠা—৪৫৬]

"বাংলা গদ্যসাহিত্যে যে দুইজন প্রতিভাবান পুরুষ এক নবযুগ আনিতে চাহিয়াছিলেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত,—তাঁহারা দুজনেই আধ্যাত্মিকতার চেয়ে নৈতিকতাকেই বড় বলিয়া জানিতেন।"

দেবেন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' শুধুমাত্র ব্রাহ্মধর্মমত প্রচারের মাধ্যম হবে; সত্যধর্ম প্রচারের জন্য হবে তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র। ১৮৪৩ সালে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হওয়ার পর "দেবেন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে এই সভা (তত্ত্ববোধিনী) ব্রাহ্মসমাজের কার্যের একটি যন্ত্রমাত্র ছিল। ...পত্রিকার প্রবন্ধ নির্বাচন প্রভৃতি লইয়া তদন্তর্গত গ্রন্থাধ্যক্ষ সভার সহিত সময়ে সময়ে দেবেন্দ্রনাথের সংঘর্ষ হইতে লাগিল।" [আত্মচরিত পৃঃ ৩৫৭]

বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রবল হয়ে উঠেছিল কারণ তিনি ধর্মমত প্রচারের ব্যাপারে নিস্পৃহ ছিলেন অথচ সংস্কারমূলক রচনার

প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল। তিনি ভেবেছিলেন ধর্মের চেয়ে নীতিপ্রচারের প্রয়োজন বেশী। এই কাজে তিনি পত্রিকার সহায়তা চেয়েছিলেন।

শেষ পর্যন্ত অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগর দুজনেই 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' থেকে সরে যান।

যদিও দেবেন্দ্রনাথ ও বিদ্যাসাগরের মধ্যে এই প্রচ্ছন্ন মতবিরোধ তাঁদের দুজনকে বিচ্ছিন্ন করেছিল, তা সত্ত্বেও তাঁরা পরস্পরকে শ্রদ্ধা করতেন যথেষ্ট। বিদ্যাসাগরের দুর্দমনীয় বিপ্লবী সত্তাকে তত্ত্ববোধিনী সভা অভিনন্দন জানিয়েছে; সংস্কার ও সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাঁকে সমর্থন জানিয়ে এসেছে। যখন 'বঙ্গদর্শন' বা 'সংবাদ-প্রভাকর' বিদ্যাসাগরকে আক্রমণ করে সমালোচনা করেছে, তখন তত্ত্ববোধিনী পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা প্রবন্ধ লিখেছে বিদ্যাসাগরের সমর্থনে। পত্রিকার ৪র্থ কল্পে (অগ্রহায়ণ ১৭৭৭ শক) ১০৪।৫ পৃষ্ঠায় 'বিধবাবিবাহ' শীর্ষক প্রবন্ধে বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তকের অকুণ্ঠ প্রশংসা করে ওই পুস্তকের 'উপক্রম ও উপসংহার' অংশগুলি উদ্ধৃত করা হয়। বিধবাবিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পর প্রথম বিবাহের সংবাদ পরিবেশন করে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' লেখে [পৌষ ১৭৭৮ শক, পৃঃ ১২৯]

"আমরা পরমাহ্লাদের সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে আমাদিগের চিরবাঞ্ছিত বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। গত ২৩শে অগ্রহায়ণ রবিবাসরে দেশবিখ্যাত শ্রীযুক্ত রামধন তর্কবাগীশ মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্যের সহিত পলাশডাঙা গ্রাম নিবাসী ভদ্রবংশোদ্ভব ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দশমবর্ষীয়া বিধবা কন্যার শুভবিবাহ সম্পন্ন হয়।" ইত্যাদি।

এই সংবাদের উপসংহারে তত্ত্ববোধিনী লেখেঃ "এই মহৎ ব্যাপার যে কয়েকটি অসামান্য ধীসম্পন্ন প্রসন্নমতি মহাত্মাদিগের সমবেত চেষ্টা দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু তন্মধ্যে মহামান্য ও সর্বাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গুণ আমরা জীবন সত্ত্বেও ভুলিতে পারিব না। তাঁহার অদ্বিতীয় নাম এই অসাধারণ কীর্তির সহিত মহীতলে চিরকাল জীবিত থাকিবে।..."

বহুবিবাহ রোধে বিদ্যাসাগরের অক্লান্ত সংগ্রামকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছে তত্ত্ববোধিনী। ৪র্থ কল্প প্রথমভাগের চৈত্র (১৬৯ পৃঃ) সংখ্যায়

ও দ্বিতীয়ভাগে—ভাদ্র (১৭৭৮ শক—পৃঃ ৬৬-৭২) সংখ্যায় দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখা হয়েছে বহুবিবাহ প্রথার নিন্দা করে এবং বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে।

সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্তর অনুরোধে একদা (১৮৪৮ খৃঃ) 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'তেই মহাভারতের বাংলা অনুবাদ আরম্ভ করেছিলেন বিদ্যাসাগর। আদিপর্ব ছাপা হওয়ার পর কালীপ্রসন্ন সিংহ বিদ্যাসাগরের কাছে এসে জানালেন যে, তিনিও মহাভারতের অনুবাদ করেছেন। তিনি বলেন, বিদ্যাসাগরও যদি মহাভারতের অনুবাদ করেন তবে কালীপ্রসন্নের বিরাট পরিশ্রম ব্যর্থ হবে। কারণ বিদ্যাসাগর ছেড়ে কেউ কালীপ্রসন্ন পড়বে না। বিদ্যাসাগর তখনই তাঁর অনুবাদের কাজ ছেড়ে দিলেন। উপরন্তু কালীপ্রসন্নকে তাঁর কাজে অনেক সাহায্য করেছিলেন। এ ঘটনা কালীপ্রসন্ন নিজেই স্বীকার করে গেছেন।

তত্ত্ববোধিনী সভা ও পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য বিদ্যাসাগর ব্রাহ্মমত দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে বলা হয়। কিন্তু তত্ত্ববোধিনী সভা যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম হননি। "১৮৩৯ সালে যখন উপনিষদবেদ্য ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করবার প্রবল আগ্রহ দেবেন্দ্রনাথের চিত্তকে অধিকার করে, তখনও তিনি ব্রাহ্মসমাজের সহিত যুক্ত হননি। এই কারণে তিনি নিজ অভিপ্রায়ের উপযোগী নূতন একটি সভা প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইলেন। তাহাই তত্ত্ববোধিনী সভা।" [মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী পৃঃ ৩৪৭]

বস্তুতঃ ধর্মাধ্যক্ষসভায় (paper committee) যে দু'একজনের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' দীর্ঘদিন পর্যন্ত আপন বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে চলেছিল, তাঁদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র ও অক্ষয়কুমারের নাম সর্বাগ্রগণ্য। দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে (বিদ্যাসাগরকে) পরোক্ষে নাস্তিক বলেছেন; কিন্তু এ কথাও ভুল। বিদ্যাসাগরের ধর্মমত উদার ছিল। তবে বেদান্ত ও অদ্বৈতচিন্তাধারার প্রভাব তাঁর ওপর ছিল, এ ধারণা অমূলক নাও হতে পারে। 'বোধোদয়' গ্রন্থে ঈশ্বর সম্বন্ধে সামান্য যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন, তার থেকে তাঁর মনোভাব অনুমান করা যেতে পারে। "ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ। তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না; কিন্তু তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান।"

বাংলা গদ্যসাহিত্যের স্রষ্টা

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্থান নির্ণয় করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—"বিদ্যাসাগর বাংলাগদ্যভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজগতি ও কার্যকুশলতা দান করিয়াছেন।"

বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবের পূর্বে বাংলাগদ্যরচনার জন্য যাঁদের নাম করা হয়ে থাকে, তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। মৃত্যুঞ্জয়ই সম্ভবতঃ বিদ্যাসাগরের পূর্ববর্তীদের মধ্যে একমাত্র লেখক—যিনি বাংলাগদ্যরচনার রীতি কিছুটা ধরতে পেরেছিলেন। ভাষাকে তিনি বিষয়োচিত করবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তবু ভাষার আড়ষ্টতা কাটিয়ে উঠতে পারেননি। মৃত্যুঞ্জয়ের হাতে ভাষা সেই কলানৈপুণ্য লাভ করেনি, যা বিদ্যাসাগরের হাতে সম্ভব হয়েছিল। মৃত্যুঞ্জয়ের পরে স্মরণযোগ্য নাম রামমোহনের। কিন্তু রামমোহনের ভাষা বিতর্কের ভাষা; ঋজু ও দৃঢ় কিন্তু কমনীয়তাবর্জিত। ভাষার গঠনপদ্ধতি দুর্বল এবং শব্দনির্বাচন কষ্টকল্পিত। রেভারেণ্ড্ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ও কয়েকখানি বই লিখেছিলেন—'উপদেশ কথা', 'বিদ্যাকল্পদ্রুম', 'ষড়দর্শন-সংবাদ'—যেগুলির ভাষা রামমোহনের মত কষ্টপ্রসূত নয়, বরং সহজ ও সরল। কিন্তু সে ভাষাও সাহিত্যের ভাষা হতে পারেনি। তার মধ্যে শিল্পনৈপুণ্যের সঙ্গে শিল্পবোধের সমন্বয় ঘটেনি; যুক্তির সঙ্গে হৃদয়-বেদনার মিলন ঘটেনি। তাই বিদ্যাসাগরের পূর্ববর্তীকালের বাংলাগদ্যের ভাষাকে জনতার মত বিক্ষিপ্ত, অবিন্যস্ত, উদ্দেশ্যহীন ও আড়ষ্ট বলে বর্ণনা করে রবীন্দ্রনাথ মোটেই অত্যুক্তি করেননি। কয়েকটি উদাহরণ দিলে ভাষার বিবর্তনের এই ইতিহাস প্রত্যক্ষ হবে।

প্রথম মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'বত্রিশ সিংহাসন' থেকে—(রচনাকাল ১৮০২)

"একদিবস রাজা অবন্তীপুরীতে সভামধ্যে দিব্যসিংহাসনে বসিয়াছেন ইতিমধ্যে এক দরিদ্রপুরুষ আসিয়া রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইল কথা কিছু কহিল না। তাহাকে দেখিযা রাজা মনের মধ্যে বিচার করিলেন যে লোক যাচ্ঞা করিতে উপস্থিত হয় তাহার মরণকালে যেমন শরীরের কম্প হয় এবং মুখ হইতে কথা নির্গত হয়না ইহারও সেইমত দেখিতেছি। অতএব বুঝিলাম ইনি যাচ্ঞা করিতে আসিযাছেন কহিতে পারেন না।"

রামমোহন রায়ের 'পথ্যপ্রদান' (রচনাকাল ১৮২৩) থেকে—

"বাস্তবিক ধর্ম্মসংহারক অথচ ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী নামগ্রহণ পূর্ব্বক যে প্রত্যুত্তর প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সমুদাযে দুইশত অষ্টাত্রিংশত পৃষ্ঠাসংখ্যক হয তাহাতে দশপৃষ্ঠাপরিমিত ভূমিকা গ্রন্থারম্ভে লিখেন। এ দশপৃষ্ঠা গণনা করা গেল যে ব্যঙ্গ ও নিন্দাসূচক শব্দ ভিন্ন স্পষ্ট কটূক্তি বিংশতি শব্দ হইতে অধিক আমাদের প্রতি উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ সমগ্র পুস্তক প্রায় দুর্ব্বাক্যে পরিপুষ্ট হয়।"

বিদ্যাসাগরের প্রথম গদ্যরচনা 'বাসুদেবচরিত' (১৮৪৪-৪৫ ?) এবং প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'বেতালপঞ্চবিংশতি'র (১৮৪৭) পূর্বে যেসব বাংলা গ্রন্থ রচিত হয়েছিল—তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গদ্যসাহিত্য বলে কোন একটি গ্রন্থেরও নাম করা যায না। কৃষ্ণমোহনের রচনা লালিত্য-বর্জিত ; তাঁর রচনার কোন নিজস্ব রীতি ছিল না। 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' থেকে উদ্ধৃতি দেওযা হল—

"এতদ্দেশের প্রাচীন ইতিহাসপুস্তকে অনেক অনেক নরপতি ও বীরদিগের দেবপুত্ররূপে বর্ণনা আছে, ইহাতে বোধ হয় পুরাকালীন লোকদের সত্যাপেক্ষা অদ্ভুত বিবরণে অধিক আদর ছিল এবং পুরাণ-লেখকেরা কবিতার ছন্দ লালিত্যাদির প্রতি অনুরক্ত হইয়া শব্দবিন্যাস করতঃ পাঠকবর্গের মনোরঞ্জন পুরঃসর বিবিধ বিষয়ে উপদেশ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন।"

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কর্তৃপক্ষের অনুরোধে বিদ্যাসাগর ছাত্রদের উপযোগী পাঠ্যগ্রন্থের রচনায় মন দিলেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতের আখ্যান-ভাগ থেকে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রকে গ্রহণ করে তিনি লিখলেন 'বাসুদেবচরিত'।

দুর্ভাগ্যের বিষয় ইংরাজশাসকবৃন্দ 'বাসুদেবচরিত'-এ পৌত্তলিকতার গন্ধ আবিষ্কার করায় বইটি ছাপা হয়নি। এই প্রথম রচনা বিদ্যাসাগরের তেইশ-চব্বিশ বছর বয়সের রচনা। পরিণত শিল্পরীতির পরিচয় এই গ্রন্থে ছিল না, কিন্তু তবু 'বাসুদেবচরিত'-এই বাংলাভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পীর আত্মপ্রকাশ। নিচের উদ্ধৃতি থেকে সমকালীন গদ্যসাহিত্যের পাশাপাশি বিদ্যাসাগরের রচনারীতির বৈশিষ্ট্য বোঝা সহজ হবে।

"অনন্তর অষ্টমমাস পূর্ণ হইলে ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষে অষ্টমীর অর্দ্ধরাত্র সময়ে ভগবান ত্রিলোকনাথ দেবকীর গর্ভ হইতে আবির্ভূত হইলেন। তৎকালে দিক্‌সকল প্রসন্ন হইল, গগনমণ্ডলে নির্মল নক্ষত্র-মণ্ডল উদিত হইল, গ্রামে নগরে নানা মঙ্গলবাদ্য হইতে লাগিল। নদীতে নির্ম্মল জল ও সরোবরে কমল প্রফুল্ল হইল। বন উপবন প্রভৃতি মধুর মধুকরগীতে ও কোকিল কলকলে আমোদিত হইল; এবং শীতল সুগন্ধি মন্দ মন্দ গন্ধবহ বহিতে লাগিল। সাধুগণের আশয় ও জলাশয় সুপ্রসন্ন হইল। দেবলোকে দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল।"

এ গদ্য স্নিগ্ধ প্রাণবান ও সাবলীল। এ গদ্যে শিল্পীর করস্পর্শ পড়েছে; ফুটে উঠেছে নিবিড় অথচ গতিময় কাব্যসুষমা। ভাষা 'সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত' হয়েছে।

সংস্কৃতসাহিত্যের শব্দভাণ্ডার লুট করে এনেছিলেন বিদ্যাসাগর। এমন কি রচনার ভাবশরীরও সংস্কৃতসাহিত্যাশ্রয়ী। তবু 'শকুন্তলা' বা 'সীতার বনবাস' সংস্কৃতের নয়, বাংলাগদ্যের মৌলিক রূপ। গদ্যের এই সাহিত্যরূপ এতদিন অনাবিষ্কৃত ছিল। বিদ্যাসাগরের হৃদয়ে যে রসানুভূতি ছিল তারই প্রকাশ ঘটলো এতদিনে। গদ্যের ভাষা তার সাধারণ অর্থকে অতিক্রম করে আর এক অনির্বচনীয় অর্থে বিমূর্ত হলো।

"..সমুদ্রে দৃষ্টিপাতমাত্র দেখিতে পাইলেন, প্রবাহমধ্য হইতে এক অদ্ভুত স্বর্ণময় মহীরুহ বহির্গত হইল। ঐ মহীরুহের শাখায় উপবিষ্ট হইয়া এক পরমাসুন্দরী পূর্ণযৌবনা কামিনী হস্তে বীণা লইয়া মধুর কোমল তানলয় বিশুদ্ধ স্বরে সঙ্গীত করিতেছে।"

"এই সেই জনস্থানমধ্যবর্তী প্রস্রবণগিরি। এই গিরির শিখরদেশ আকাশপথে সতত সঞ্চরমান জলধরমণ্ডলীর যোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত।"

এই ভাষাই আদর্শগদ্যের ভাষা ; ছন্দমধুর ও ব্যঞ্জনাময়। "তাঁহার পূর্ব্বে কেহই এইরূপ সুমধুর বাংলাগদ্য লিখিতে পারে নাই, এবং তাঁহার পরেও কেহ পারে নাই।" [বঙ্কিমচন্দ্র]

কিন্তু শুধু গদ্যের ভাষাই নয়, তার ভাবদেহে তিনি প্রাণসঞ্চার করেছিলেন। শকুন্তলা ও সীতা তাঁর হাতে পৌরাণিক বেশ ত্যাগ করে বাঙ্গালীর বেশে এসে দাঁড়িয়েছিল। স্নেহে ব্যথায় ও আবেগে মণ্ডিত, সহানুভূতিতে নিবিড় ঘরোয়া বাঙ্গালী জীবন। মূল রচনা না হয়েও তাঁর গ্রন্থগুলি অনন্য সাহিত্যসৃষ্টি। পরবর্তীকালের সকল শ্রেষ্ঠ লেখকের কাছেই প্রেরণাস্বরূপ। "বিদ্যাসাগর মহাশয় বাংলাগদ্যের ছন্দভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহারই উপরে বঙ্কিম ও পরে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের কারুরীতির অশেষ নিদর্শন নির্মাণ করিয়াছেন।" [মোহিতলাল মজুমদার, সাহিত্যবিতান]

বিদ্যাসাগরের সমসাময়িককালে যাঁরা গদ্যরচনার কাজে হাত দিয়েছিলেন তাঁদের নামও প্রসঙ্গক্রমে উঠতে পারে। কৃষ্ণমোহনের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। অক্ষয়কুমার দত্ত নিঃসন্দেহে সেকালের শক্তিমান লেখক। তাঁর মন যুক্তিনিষ্ঠ ও সংস্কারমুক্ত ছিল। কিন্তু তাঁর গদ্যের ভাষা আড়ষ্ট ; পাঠককে তাঁর বাচনভঙ্গিমায় কেবলই বাধা পেতে হয়। সেদিন অক্ষয়কুমারই 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক ছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর 'পত্রিকা'তে প্রকাশযোগ্য প্রবন্ধগুলির এমন কি সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্তর প্রবন্ধগুলিরও ভাষার সংশোধন করে দিতেন। এর দ্বারা বোঝা যায়, সে যুগেও অক্ষয়কুমারের ওপর তাঁর সাহিত্যিকপ্রতিষ্ঠা স্বীকৃত হয়েছিল। আর এ যুগের সমালোচক মোহিতলাল বলেন—"তিনি যে কেবল বাংলাগদ্যের আবিষ্কর্তা নহেন, পরন্তু তাঁহার রচনা যে বাংলাগদ্য-সাহিত্যের সর্বগুণান্বিত ক্লাসিক, 'বেতালপঞ্চবিংশতি' হইতে আরম্ভ করিয়া 'আত্মজীবনচরিত' পর্য্যন্ত পাঠ করিলে প্রতিপত্রে ও প্রতিছত্রে তাহার প্রমাণ মিলিবে।"

'সীতার বনবাস'-এর ভাষায় যেমন অপূর্ব শিল্পনৈপুণ্য ও কাব্যসুষমার সমন্বয় ঘটেছে, তেমনই প্রাবন্ধিকভাষা গড়ে উঠেছে 'বিধবাবিবাহ', 'বহুবিবাহ' প্রভৃতি বইগুলিতে। এগুলির ভাষা তীক্ষ্ণ, দৃঢ়, যুক্তিনিষ্ঠ অথচ প্রাঞ্জল। কখনও বিদ্রূপে শাণিত, কখনও বা আবেগে করুণ।

প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য এ ভাষার সৃষ্টি। অথচ মানবিক-বেদনাবোধ, সততা ও নিষ্ঠা প্রতি ছত্রে ছত্রে। সবার ওপরে লক্ষণীয়—লেখকের গভীর সংযম ও শুচিতাবোধ। কোন অবস্থাতেই শালীনতা-বোধকে বিসর্জ্জন দেননি বিদ্যাসাগর। তাই তাঁর বিতর্কের ভাষাও আদর্শ ভাষা ;—ব্যঙ্গ্যাত্মক তবু পরিচ্ছন্ন।

"হা ভারতবর্ষ! তুমি কি হতভাগ্য! তুমি, তোমার পূর্ব্বতন সন্তানগণের আচারগুণে, পুণ্যভূমি বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছিলে; কিন্তু তোমার ইদানীন্তন সন্তানেরা স্বেচ্ছানুরূপ আচার অবলম্বন করিয়া, তোমাকে যেরূপ পুণ্যভূমি করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া দেখিলে সর্ব্বশরীরে শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়।" [বিধবাবিবাহ]

"তর্কবাচস্পতি মহাশয, দয়া করিয়া আমায় যে এই উপদেশ দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। আমি তাঁহার মত সর্ব্বজ্ঞ নহি; সুতরাং পুস্তকবিরহিত অথবা উপদেশনিরপেক্ষ হইয়া, বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারি, আমার এরূপ সাহস বা এরূপ অভিমান নাই। তর্ক-বাচস্পতি মহাশয় সবিশেষ অবগত ছিলেন, এজন্য পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমি সংস্কৃত পাঠশালা হইতে একগাড়ী পুস্তক আহরণ করিয়াছি। কিন্তু দেখ, তিনি কেমন সরল, কেমন পরহিতৈষী ; একগাড়ী পুস্তক পর্য্যাপ্ত হইবেকনা, যেমন বুঝিতে পারিয়াছেন, অমনি দুইগাড়ী পুস্তক আহরণে উপদেশ দিয়াছেন।" [বহুবিবাহ]

এ কথা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় যে, বাংলাভাষাকে যিনি সুবিন্যস্ত করে গড়লেন, এবং বাংলাগদ্যের সাধুরূপ যিনি সৃষ্টি করলেন, তিনি কিন্তু সাহিত্যসৃষ্টির সাধনায় কোনদিন বসেননি। বসেননি কথাটা হয়ত ঠিক নয়, ব্যক্তিজীবনে অবসর তাঁর এতই কম ছিল যে, নিজের আত্ম-চরিতটিও সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি। আত্মচরিতের কয়েকটি পৃষ্ঠা ছাড়া আর একটিমাত্র লেখা পাওয়া যায় যা অপ্রয়োজনের লেখা। সেটির নাম 'প্রভাবতী সম্ভাষণ'। যিনি বাংলাগদ্যের জনক, তাঁর মৌলিক সাহিত্যকর্ম নেই কেন, একথা জিজ্ঞাস্য হতে পারে বইকি। বস্তুতঃ সাহিত্যের সাধনায় তিনি কেন বসেননি, একথা না ভাবলে বিদ্যাসাগরকে বুঝতে অসুবিধেই হবে।

এই কথাটিই শ্রীভূদেব চৌধুরী তাঁর "বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা"য়

ব্যক্ত করেছেন অন্যভাবে—"বিদ্যাসাগর নিজব্যক্তিত্বের গভীরে এক ব্যাপক নিরাসক্তি ও উদার মূল্যবোধ রচনা করেছিলেন।"

বিদ্যাসাগরের জীবনে আসলে আত্মচিন্তার কোন অবকাশ ছিল না। যে মানুষ সমাজের সমস্ত গ্লানি মোচনের দায়িত্ব নিয়ে সংগ্রামী সৈনিকের মত শুধু লড়াই করে গিয়েছেন, সমাজের প্রতিটি মানুষের প্রতি করুণায় উৎসারিত হয়ে যিনি আচার ও কুসংস্কারের পলি সরিয়ে সমাজকে-স্বচ্ছতোয়া স্রোতস্বতীতে পরিণত করতে কৃতসংকল্প, তাঁর জীবনে আত্ম চিন্তার স্থান কোথায়। নিজের জীবন দিযেই তিনি এক অমর সাহিত্য রচনা করেছেন। দারিদ্র্যের ঝড় জল ঠেলে, জীবনের কৃচ্ছ্র তাকে অবজ্ঞা করে যিনি মানবকল্যাণের দীপবর্তিকা জ্বালাতে এগিয়ে যান, তাঁর জীবনের পরিমাপ করবে কে?

সাহিত্যরচনা করে কালক্ষেপ করার মত সময় তাঁর হাতে ছিল না। একমাত্র লক্ষ্য মানুষের দুঃখমোচন। কল্যাণবোধের প্রেরণা থেকেই তাঁর কর্ম। জীবনে তাই জ্ঞান, কর্ম ও সত্যবোধের সঙ্গে বৈরাগ্যের মিলন ঘটেছে। চির অপরাজিত যোদ্ধা পুঞ্জীভূত অন্যায়, অসত্য অন্ধতা ও অজ্ঞতার সঙ্গে সংগ্রাম করে ক্লান্ত। চকিতের অবসরে তিনি চেয়ে দেখেছেন, বনবাসিনী সীতার মধ্যে নির্যাতিত নারীজাতির কান্না জমাট হয়ে লুকিয়ে আছে। তিন বছরের মেয়ে প্রভাবতীর বিয়োগে তাঁর পুরুষহৃদয় হাহাকারে ভরে উঠেছে। কিংবা সেই শিশুমেয়েটিকে লক্ষ্য করেই তিনি বুকের জমা বিক্ষোভকে প্রকাশ করেছেন—"একমাত্র তোমায় অবলম্বন করিয়া এই বিষময় সংসারে অমৃতময় বোধ করিতে-ছিলাম…" অর্থাৎ সংসার অকৃতজ্ঞতায় বিষময় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সে অনুভূতিকে প্রকাশ করার অবসরই বা কোথায়? তাঁকে ছুটতে হয়েছে তারানাথ, দ্বারকানাথদের বিতর্কযুদ্ধের আসরে।

বিদ্যাসাগরের সাহিত্যসৃষ্টির সূচনাই হয়েছে প্রয়োজনবোধের তাগিদ থেকে। ফোর্ট উইলিয়ামে তাঁকে পড়াতে হতো হরপ্রসাদ রায়ের 'পুরুষপরীক্ষা' ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'প্রবোধচন্দ্রিকা'। বই দুটির ভাষা এতই অশালীন ছিল যে শিক্ষক বিদ্যাসাগর বিব্রতবোধ করতেন। তাই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের জন্য লিখলেন 'বেতালপঞ্চবিংশতি' (১৮৪৭)। যিনি 'সীতার বনবাস' লিখলেন, তিনিই শিশুদের জন্য রচনা

করতে বসলেন 'বর্ণপরিচয়'। প্রয়োজনের তাগিদেই লিখলেন 'বোধোদয়' (১৮৫১), 'ঋজুপাঠ' (১৮৫১), 'কথামালা' (১৮৫৬), ও 'আখ্যানমঞ্জরী' (১৮৬৩)—ইংরাজী সাহিত্য ছেঁকে তিনি অনুবাদ করলেন—কিন্তু সে অনুবাদ স্রষ্টার হাতের যাদুস্পর্শে মূল রচনাশৈলীর মাধুর্যে প্রকাশিত। শুধু শিশুশিক্ষার বইও নয়, সমাজের কলুষনাশের জন্য লেখনী ধারণ করে লিখলেন 'বিধবাবিবাহ', 'বহুবিবাহ' প্রভৃতি গ্রন্থ। সে যুগে সংস্কৃতশিক্ষার্থী ব্যক্তিদের মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ মুখস্থ করার নিদারুণ প্রয়াস দেখে ব্যথিত হয়ে সৃষ্টি করলেন সরল ও সহজ 'উপক্রমণিকা'র। অর্থাৎ যেখানে যা প্রয়োজন, তারই জন্য বিদ্যাসাগর সজাগ। যিনি সকল মানুষের অভাবকে জেনেছেন, ব্যক্তিগতজীবন তাঁর কাছে তুচ্ছ হয়ে গেছে।

তাই খণ্ডিত শিল্পীসত্বা, ও দার্শনিকসত্বাকে অতিক্রম করে, সাহিত্যিক বিদ্যাসাগরকে ছাড়িয়ে যে সমগ্র বিদ্যাসাগরের রূপ আমাদের চোখে প্রতিভাত, সে বিদ্যাসাগর মানবিক চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ, বিপ্লবীনায়ক বিদ্যাসাগর। সকল তুচ্ছতার গণ্ডি পার হয়ে, তিনি সর্বকালের সকল মানুষের জন্য উৎসর্গীকৃত।

রামকৃষ্ণ ও বিদ্যাসাগর

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর সমসাময়িক কালে দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও বিদ্বেষ দুইই সমপরিমাণেই লাভ করেছিলেন। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিকে তিনি বিক্ষুব্ধ, এমনকি ক্রুদ্ধ করে তুলেছিলেন তাঁর নির্ভীক মতামত ও কাজে। বিধবা মেয়েদের বিবাহ দেওয়ার ব্যাপারে যেভাবে অগ্রণী হয়েছিলেন, তাতে অনেকেরই শিরঃপীড়া ঘটেছিল। সংস্কৃত কলেজে কায়স্থ ও শূদ্রের প্রবেশাধিকার দেওয়া, গণিকা পুত্রের উচ্চশিক্ষা লাভের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া থেকে শুরু করে হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের ন্যায়সঙ্গত ব্যাখ্যা—প্রত্যেকটি ব্যাপারেই তিনি কিছু না কিছু লোকের অপ্রীতি কুড়িয়েছেন। প্রচলিত সমস্ত সংস্কার ও সামাজিক অনুশাসন ভাঙবার দায়িত্ব যেন তিনি একাই নিয়েছিলেন। তিনি শুধু বহুবিবাহেরই বিরোধী ছিলেন না, বৃদ্ধের বালিকা বিবাহের ঘটনাকেও ক্ষমার চোখে দেখেননি। সমাজের তর্করত্ন, বিদ্যাবাগীশ থেকে শুরু করে বহু বিশিষ্ট লোকও তাই তাঁর বিরোধী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের অনেকেই বিদ্যাসাগরকে ভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট, নাস্তিক ইত্যাদি আখ্যায় ভূষিত করেছেন। সেই বিদ্যাসাগর সম্পর্কে পরমহংসদেব কি ধারণা পোষণ করতেন, তা জানবার জন্যে কৌতূহলী হয়ে ওঠা খুব স্বাভাবিক।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের অন্যতম। তাঁর নেতৃত্বেই হিন্দুধর্মের নবজাগরণ সম্ভবপর হয়েছিল। তাঁর ব্যক্তিত্বের অসামান্য প্রভাব কম-বেশী সকলকেই স্পর্শ করেছে। রামকৃষ্ণ একদিন তাঁর সহচরদের জানালেন যে, তিনি বিদ্যাসাগরকে একবার দেখতে যাবেন। তারা বিস্মিত হয়ে তাঁর মুখের দিকে চাইলো। কারণ, তারা বুঝতে পারছিল না, রামকৃষ্ণ

নিজে কেন যাবেন! বিদ্যাসাগরের কাছে তাঁর কি দরকার থাকতে পারে?

রামকৃষ্ণ বুঝতে পেরে বললেন—ওরে, মায়ের ভালবাসা আছে বলেই ত ও অমন হয়েছে। তাঁর দয়া না থাকলে কি কেউ অত বড় হতে পারে?

একদিন রামকৃষ্ণ সত্যিই এসে হাজির। বিদ্যাসাগর চেয়ার থেকে উঠে তাঁকে বসাতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু রামকৃষ্ণ মেঝের ওপরেই বসে পড়লেন। বললেন—এতদিন শুধু নালা, নর্দমা ডিঙিয়েছি; ডোবা আর পুকুর পার হয়েছি। এবার সাগরে এলাম।

বিদ্যাসাগরের হৃদয়ও কৌতুকরসে ভরা ছিল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন—যখন এসে পড়েছেন, তখন ত আর উপায় নেই; খানিকটা নোনা জলই নিয়ে যান। আর যদি জাল ফেলতে চান, বড়-জোর কুচো মাছ, আর নইলে ঝিনুকের খোলা উঠতে পারে। তার বেশী কিছু নেই।

রামকৃষ্ণও উত্তর দিলেন—না গো না, নোনা জল নেব কেন? এযে দুধের সাগর, দইয়ের সাগর, মধুর সাগর। তুমি ত অবিদ্যা নও, বিদ্যাসাগর। আমি যখন এসেছি তখন মুক্ত কুড়িয়ে নিয়ে যাব।

বিদ্যাসাগরের ধর্মমত কি ছিল, তিনি হিন্দু দেবদেবীতে বিশ্বাস করতেন কি না—তার কোন ইঙ্গিতই তাঁর ব্যবহারে কখনও পাওয়া যায়নি। বিদ্যাসাগর জীবনীকার সুবলচন্দ্র মিত্র একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন, যার থেকে তাঁকে বোঝা কিছুটা সহজ হবে।

১৮৭৩ সালের নভেম্বর মাসে বিদ্যাসাগর হঠাৎ খবর পেলেন কাশীতে তাঁর বাবা ঠাকুরদাস অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। বিদ্যাসাগর ছুটে গেলেন। বাবাকে সেবা-শুশ্রূষা করে নিজে হাতে রেঁধে খাইয়ে সুস্থ করে তুললেন।

একদিন বাপ ও ছেলে দুজনেই বসে আছেন, এমন সময় এক ভদ্রলোক এসে হাজির হলেন। ঠাকুরদাস অপরিচিত মুখ দেখে ভাবলেন ঈশ্বরের চেনা কেউ হবে। বিদ্যাসাগরও কিন্তু মনে করলেন—ভদ্রলোক তাঁর বাবার পরিচিত কেউ। তিনি তাই কথা না বলে ভেতরে উঠে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে শুনলেন—ভদ্রলোক কিছু না বলেই উঠে গেছেন।

ঠাকুরদাস বললেন—আমি ত দেখিনি কখনও। ভাবলাম তোমার চেনা লোক। বিদ্যাসাগর লজ্জিত হয়ে তখনই বেরিয়ে পড়লেন। বাঙালী টোলায় গিয়ে অনেক খুঁজে বার করলেন সেই লোকটিকে এবং জানতে চাইলেন কি তাঁর বলার ছিল।

ভদ্রলোক বললেন—আপনি কাশী এসেছেন শুনে আমি আপনাকে দেখবার জন্য ছুটে গিয়েছিলাম। কিন্তু একটি ক্ষুদ্র প্রশ্নও ছিল। জানি না আপনি উত্তর দেবেন কিনা।

বিদ্যাসাগর তাঁর প্রশ্ন কি—তা জানতে চাইলে ভদ্রলোক বললেন—আপনি ধর্ম মানেন কিনা, এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন কিনা শুধু এইটুকুই আমি জানতে চাই।

বিদ্যাসাগর বললেন—এ সম্বন্ধে আমি কোন আলোচনা কোথাও করিনি। আপনার সঙ্গেও করবো না। তবে আমি বিশ্বাস করি, প্রত্যেকে তার মনের বিশ্বাস অনুযায়ী চলবে।

বিদ্যাসাগর একটু থেমে আবার বললেন—যার যেখানে বিশ্বাস, তার ধর্মও সেখানে। আপনি যদি মনে করেন, গঙ্গাস্নানে মুক্তি, যদি ভাবেন শিবপূজা করলে ধর্ম—তবে সেটাই আপনার বিশ্বাস ও আপনার ধর্ম।

আরও কিছু আগেকার কথা। বিদ্যাসাগরের মা ও বাবা দুজনেই তখন কাশীবাসী। তিনি এসেছেন মা ও বাবাকে দেখতে। একদিন কাশীর ব্রাহ্মণদের একটি দল বিদ্যাসাগরের কাছে এলেন। তাঁদের বক্তব্যঃ বিদ্যাসাগর তো বড়লোক মানুষ; যত্রতত্র প্রচুর অর্থ দান করে থাকেন। আজ তিনি যখন কাশী এসেছেন, তখন ব্রাহ্মণদের অন্ততঃ হাজার পাঁচেক টাকা দান করে যান। ব্রাহ্মণকে দান না করলে কাশী আসা সার্থক হয় না।

উত্তরে বিদ্যাসাগর জানালেন—তিনি কাশী দেখতে আসেননি; এসেছেন, তাঁর বাপ-মাকে দেখতে। তারপর মুখ তুলে মৃদুস্বরে কিন্তু দৃঢ় ভঙ্গিতে জানালেন যে, যে-সব লোক কোন সৎকর্ম করে না, শুধু পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে খেতে চায়, তাদেরকে ব্রাহ্মণ বলে বা বিশ্বেশ্বর বলে যে মনে করে সে নরাধম।

ব্রাহ্মণেরা সক্রোধে বললেন—আপনি কি কাশী বিশ্বেশ্বরও মানেন না?

উত্তর হল—আপনাদের কাশী বা আপনাদের বিশ্বেশ্বরকে আমি মানি না।

—আপনি কি মানেন তবে? সমবেত কণ্ঠে তাঁরা চীৎকার করে উঠলেন।

বিদ্যাসাগর উত্তর দিলেন—আমার বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা—উপস্থিত এই পিতৃদেব ও জননী দেবী বিরাজমান। জনক জননীকেই আমি পরমেশ্বর জ্ঞান করি।

জননীর মৃত্যুর পর ঈশ্বরচন্দ্র কাশীপুরের গঙ্গাতীরে চন্দনধেনু করে যথারীতি শ্রাদ্ধকায সমাধা করেন। তারপর এক বছর একবেলা স্বপাকে হবিষ্যান্ন ভোজন করেছিলেন। এই সময়ে তিনি জুতো পরাও ছেড়ে দিয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগর বক্তা ছিলেন না। রাজনীতিক নেতাদের মত তিনি আদর্শ প্রচার করে বেড়াননি। নিজের কথা অন্যকে শোনাবার জন্য কোন ব্যস্ততা ছিল না তার। কিন্তু তিনি একাগ্র ছিলেন মানুষের চিন্তায়। মানুষের কল্যাণের জন্য তিনি সমাজকে ভাঙ্গতে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁর এই মানবমুখী মনোভাবই তাঁকে বরেণ্য করে তুলেছিল। মানুষের সেবার মধ্যে দিয়েই তিনি ঈশ্বরকে সেবা করেছেন। মহাপুরুষ রামকৃষ্ণ তাই বিদ্যাসাগরকে ঈশ্বরের আশীর্বাদপ্রাপ্ত মানুষ বলে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। তাঁর সহচরদের কাছে রামকৃষ্ণ যা বলেছিলেন, সেই কথাগুলিকে নীচে উদ্ধৃত করা হল ঃ

"বিদ্যাসাগরের অনেক গুণ। প্রথম, বিদ্যানুরাগ। দ্বিতীয়, দয়া সর্বজীবে। বিদ্যাসাগর দয়ার সাগর। বাছুরেরা মায়ের দুধ পায় না দেখিয়া নিজে কয়েক বৎসর ধরিয়া দুধ খাওয়া বন্ধ করিয়াছিলেন। শেষে শরীর অতিশয় অসুস্থ হওয়াতে অনেকদিন পরে আবার ধরিয়াছিলেন। গাড়ীতে চড়িতেন না,—ঘোড়া নিজের কষ্ট বলিতে পারে না। একদিন দেখিলেন একটি মুটে কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া রাস্তায় পড়িয়া আছে ও কাছে ঝাঁকাটা পড়িয়া আছে। দেখিয়া নিজে কোলে করিয়া তাহাকে বাড়ীতে আনিলেন ও সেবা করিতে লাগিলেন। তৃতীয়, স্বাধীনতাপ্রিয়তা। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একমত না হওয়াতে

সংস্কৃত কলেজের প্রধান অধ্যক্ষের কাজ ছাড়িয়া দিলেন। চতুর্থ, মিথ্যা সম্মান বোধ তাঁর ছিল না। একটি শিক্ষককে ভালবাসিতেন; তাঁহার কন্যার বিবাহের সময়ে নিজে আইবুড় ভাতের কাপড় বগলে করিয়া আসিয়া উপস্থিত। পঞ্চম, মাতৃভক্তি ও মনের বল। মা বলিয়াছিলেন—'ঈশ্বর তুমি যদি এই বিবাহে (ভ্রাতার বিবাহে) না আস, তাহলে আমার মন বড় খারাপ লাগবে।' তাই কলিকাতা হইতে হাঁটিয়া গেলেন। পথে দামোদর নদী, নৌকা নাই; সাঁতার দিয়া পার হইয়া গেলেন। সেই ভিজা কাপড়ে বিবাহ রাতেই বীরসিংহায় মার কাছে গিয়া উপস্থিত; বলিলেন—মা এসেছি।"

রামকৃষ্ণ ও বিদ্যাসাগর ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে দুটি মহত্তম চরিত্র। রামকৃষ্ণ ছিলেন ভক্ত ও সাধক; জাগতিক ব্যাপারে নিস্পৃহ। বিদ্যাসাগর ছিলেন মানবপ্রেমিক কর্মযোগী; ঈশ্বর বিষয়ে নির্লিপ্ত। রামকৃষ্ণ ধর্মকে সঙ্কীর্ণতার পরিধি থেকে মুক্ত করেছেন; আর বিদ্যাসাগর সমাজকে সংস্কার ও অনুষ্ঠানসর্বস্বতা থেকে মুক্তি দিয়েছেন। রামকৃষ্ণের হৃদয়ে জ্ঞানাশ্রিত দয়া। বিদ্যাসাগরের হৃদয়ে করুণার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল পৌরুষ। তবু দুই বিপরীতমুখী এই ব্যক্তিত্বের মূল কেন্দ্র ছিল এক—মানবকল্যাণ চিন্তা।

নিঃসঙ্গ জীবন

দেশ ও সমাজের কাজে যিনি বরেণ্য, মানুষের হৃদয়ে যিনি মহামানব-রূপে পূজিত, দেখা যায়, ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নিঃসঙ্গ ও একক। এর একটি কারণ এই যে, তিনি সর্ববিষয়ে সময়ের অগ্রগামী হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রগামী চিন্তাধারাকে অনুসরণ করা সহগামীদের পক্ষে সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। বন্ধুবান্ধব এমন কি আত্মীয়স্বজনও সেই মহৎ আদর্শের সামনে বাধার মত এসে দাঁড়ায়। ফলে, দেশ ও কালের নিয়মকে যিনি নতুন করে গড়তে এসেছেন, তিনি ব্যক্তিগত জীবনে হন একক সঙ্গীহীন। বিদ্যাসাগরের সম্পর্কে এ কথা বিশেষভাবে বলা যায়। তাঁর জীবনীকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এ কথা অনুভব করেছেন [বিদ্যাসাগর জীবনচরিত] যে, ব্যক্তিগত জীবনে বিদ্যাসাগর অত্যন্ত অসুখী ছিলেন। আপন মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে দেশ কাল ও সমাজের বিরুদ্ধে তিনি আজীবন যুদ্ধ করেছেন। তাঁর অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসজনিত অসহিষ্ণুতাও তাঁকে পারিবারিক জীবনেও দুঃখের পথেই টেনে নিয়ে গেছে।

বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে তিনি আস্তে আস্তে দূরে সরে গেছেন, এর দায়িত্ব হয়ত সবটুকু বন্ধুবান্ধবদের নয়। অর্থাৎ বাইরের জগতে যিনি অবিচল বিপ্লবী, বন্ধু ও স্বজনের জগতেও তিনি অসহিষ্ণু ব্যক্তিত্ববাদী। অসহিষ্ণুতা এমন একটি বস্তু যা প্রখর আত্মবিশ্বাস, মর্যাদাবোধ ও স্পর্শসচেতন মনোভাবের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে থাকে। বহু বিশিষ্ট জননায়কের চরিত্রেই এই অসহিষ্ণুতার ভাব প্রত্যক্ষ হয়ে দেখা দিয়েছে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের জীবনে এর ফলে যে ঝড় নেমে এসেছে, তাতে তাঁর নিজের জীবনই ভেঙ্গে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে।

বিদ্যাসাগরের কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধুর নাম করা যেতে পারে। তাঁদের অন্যতম হলেন শ্রীমদনমোহন তর্কালঙ্কার। মদনমোহন তাঁর বাল্যবন্ধু এবং সমমতাবলম্বী ছিলেন। বিদ্যাসাগরকে অনুসরণ করার জন্য তাঁকেও অনেক কৃচ্ছ্রতা ও ক্লেশ সহ্য করতে হযেছে। স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে বিদ্যাসাগর অগ্রণী হলে মদনমোহন নিজের মেয়েদুটিকেই আগে পাঠিয়েছেন। সংস্কৃত প্রেস ও ডিপোজিটারির ব্যাপারেও তাঁর সহায়তা বিদ্যাসাগর স্বীকার করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও মদনমোহন ও বিদ্যা-সাগরের মধ্যে যে বিরোধ জেগেছে তার ফলে দুজনেই দুজনের মুখ দর্শন করা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। মদনমোহনের জামাতা যোগেন্দ্রনাথও এ বিরোধের সূত্র নিয়ে বিদ্যাসাগরকে গালি দিযেছেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরও কম বেদনা পাননি। মদনমোহনের মৃত্যুর পবে তাঁর মাতা ও কন্যাকে তিনি মাসহারা দিয়েছেন। বন্ধুবিচ্ছেদের বেদনাও ভোগ করেছেন।

বিচ্ছেদ ঘটেছে তারানাথ তর্কবাচস্পতির সঙ্গেও। বহুবিবাহ নিরোধের চেষ্টায বিদ্যাসাগর যখন দাঁড়ালেন, তখন স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে বহুবিবাহের কুফলগুলিকে একটি পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ করে দেখালেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি বহুবিবাহের বিরুদ্ধে স্বাক্ষর সংগ্রহ করলেন। তৃতীয়তঃ বহুবিবাহ 'শাস্ত্রবিরুদ্ধ' ঘোষণা করে বহুবিবাহ রোধের অনুকূলে আইন সৃষ্টির চেষ্টা করলেন।

তারানাথ 'বহুবিবাহ' যে কুপ্রথা একথা স্বীকার করে বললেন—বহুবিবাহ রোধ হওয়া উচিত। কিন্তু এই কাজকে শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলতে তিনি অস্বীকার করলেন এবং প্রকাশ্যে যুক্তি ও উদ্ধৃতি দিযে বললেন—বহুবিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ নয়।

এর ফলে তারানাথ তর্কবাচস্পতির সঙ্গে তাঁর বাক্যালাপ বন্ধ হয়ে গেল।

রাজা রামমোহনের পুত্র রমাপ্রসাদ বিধবাবিবাহের ব্যাপারে বিদ্যাসাগরকে সমর্থন জানিয়েছিলেন, কিন্তু প্রকাশ্যে এসে দাঁড়াতে রাজী হননি। ফলে বিদ্যাসাগর তাঁর সংশ্রব ত্যাগ করেন। অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ যে তাঁকে অকুণ্ঠ সমর্থন দেবে না, কিংবা তাঁর বিরুদ্ধে কোন কথা বলবে—এটা অনেক সময়ই তিনি সহ্য করতে পারতেন না। ফলে বিরোধ আসন্ন হয়ে উঠতো।

সামাজিক ক্ষেত্রে তাঁকে প্রচণ্ড বিরোধিতার সামনে দাঁড়াতে হয়েছিল। রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ তাঁকে—শত্রু বলে গণ্য করেছে। প্রকাশ্য রাস্তায় তাঁর ওপর ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ বর্ষিত হয়েছে। কিন্তু যিনি বিপ্লবী মনোধারা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন তাঁকে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়েই আসতে হয়। বিদ্যাসাগরও সেদিন একক যোদ্ধা ছিলেন। কোন ভয়ই তাঁকে শিথিল করতে পারেনি। সরকারী রোষকে তিনি উপেক্ষা করেছেন। চাকরি ছেড়ে দিয়েও দায়িত্ব পালনে পরাঙ্মুখ হননি। কিন্তু তবুও আঘাত পেয়েছেন, যখন প্রত্যাঘাত এসেছে অন্তরঙ্গদের কাছ থেকে।

তাঁর দয়ার্দ্র হৃদয়ের সুযোগ নিয়ে বহুলোক তাঁকে ঠকিয়েছে। যারা তাঁর সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তারাও পরবর্তীকালে তাঁকে উপেক্ষা করেছে। জনৈক টোলের পণ্ডিত তাঁর কাছ থেকে মাসিক অর্থসাহায্য নিয়েছে, তার প্রথমা পত্নী ও প্রথমা পত্নীর কন্যাকে পালনের জন্য। কিন্তু হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করেছেন বিদ্যাসাগর যে, কন্যাকে তিনি আদৌ আশ্রয় দেননি। কোন দুঃস্থ ছাত্রকে বছরের পর বছর ধরে তাঁর প্রকাশিত বইগুলি সাহায্য হিসাবে দেওয়ার পর হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করেছেন যে, সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি দুঃস্থও নয়, ছাত্রও নয়। এক অসাধু পুস্তক-বিক্রেতা। ফলে মানুষের প্রতি তাঁর বিশ্বাস যেন শিথিল হয়ে এসেছে।

চিন্তায় অতি স্বাতন্ত্র্যবোধ থাকার জন্য প্রতিক্ষেত্রেই এই বিরোধ সুস্পষ্ট। একদিকে চাকরির স্থান থেকে সরে আসতে হয়েছে ; গভর্নর ক্যাম্পবেলের সঙ্গে মতপার্থক্য ঘটায় তাঁর বইগুলি পাঠ্যপুস্তকের তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। অন্যদিকে বেথুন স্কুল, ওয়ার্ডস্ ইন্‌স্টিটিউশন, হিন্দু ফ্যামিলি এ্যান্নুয়িটি ফাণ্ড্ প্রত্যেকটি থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁকে বেরিয়ে যেতে হয়েছে। মৃত্যুর পূর্বাহ্ণে ভ্রষ্টা বিধবা নারীর উত্তরাধিকার-গত প্রশ্নে তিনি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তৎকালীন বঙ্গসমাজ তার জন্য তাঁকে ধিক্কার দিয়েছিল। এমন কি তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সুহৃদ দ্বারকানাথ মিত্রও এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ বিরুদ্ধমত পোষণ করেছেন।

অবশ্য এগুলো এমন কিছু নয়। যে বিদ্রোহী প্রচলিত চিন্তা-ধারায় ভাঙ্গন ধরাতে আসে, তাকে অনেক বেশী বাধা, অনেক বড়

আঘাত সহ্য করতে হয়। কিন্তু বিদ্যাসাগর বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছিলেন পারিবারিক জীবনের কয়েকটি ঘটনায়।

অনুজ দীনবন্ধু ও ঈশানচন্দ্রের সঙ্গে বিরোধ বিদ্যাসাগরের জীবনে একটি দুঃখজনক ঘটনা। এর ফলেই বিদ্যাসাগর স্বগ্রাম বীরসিংহ চিরদিনের জন্য ত্যাগ করে চলে আসেন।

দীনবন্ধু বা তৃতীয় ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র সম্বন্ধে অভিযোগ করার মত খুব বেশী কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না। বরং দেখা যায় শম্ভুচন্দ্র অগ্রজের প্রভাবে তাঁর আজ্ঞাবর্তী হয়েই জীবন কাটিয়েছেন। দীনবন্ধু পণ্ডিত, দয়ালু ও অমায়িক ব্যক্তি ছিলেন—তাও শম্ভুচন্দ্রের লেখা 'বিদ্যাসাগর জীবনচরিত' থেকে জানা যায়।

দীনবন্ধুর সঙ্গে বিরোধের সূচনা ১৮৬৮ সালে। প্রেসের কাজ কিছুতেই ভালভাবে চলছিল না। বিদ্যাসাগর কতকটা বিরক্ত হয়েই প্রেস ও ডিপোজিটরি ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় নামের এক ভদ্রলোককে দান করেন।

অথচ বিদ্যাসাগর প্রেস ছেড়ে দেবেন শুনে প্রেস কিনবার জন্য কোন ব্যক্তি দশ হাজার টাকা দাম দিতে চান। অন্যদিকে বিদ্যাসাগরের মাথায় তখন পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকার মত ঋণ। স্বভাবতঃই প্রেস দান করার সংবাদে তাঁর ভাইয়েরা বিক্ষুব্ধ হন। দীনবন্ধু আপত্তি জানিয়ে বলেন—প্রেসে আমারও অংশ আছে; আমার অংশ তুমি দান করতে পারো না।

কোন কাজে বাধা পেলে বিদ্যাসাগর ক্রুদ্ধ হয়ে পড়তেন। নিজের ভাইয়ের কাছ থেকে আপত্তি আসায় তিনি হঠাৎ অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে পড়লেন। তখনই ব্যাপারটির নিষ্পত্তির জন্য দুর্গামোহন দাস নামের এক সম্ভ্রান্ত উকীলকে সালিসি নিযুক্ত করেন। সাক্ষী হিসাবে ডাকা হয় শম্ভুচন্দ্র ও পিতৃব্যপুত্র পীতাম্বরকে এবং আরও কয়েকজনকে। বিরোধ প্রকাশ্যে গিয়ে পড়ছে দেখে শম্ভুচন্দ্র ও দীনবন্ধু অত্যন্ত লজ্জিত হন। শম্ভুচন্দ্রের অনুরোধে তখন দীনবন্ধু একটি লিখিত পত্রের মারফত প্রেসের ওপর তাঁর সমস্ত স্বত্ব ত্যাগ করেন। এই ঘটনার ফলে বিদ্যাসাগর ও দীনবন্ধুর মধ্যে সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। এমন কি দীনবন্ধুর স্ত্রীকে পাঠানো টাকা বিদ্যাসাগরের কাছে ফেরত আসে।

পরের বছর অর্থাৎ ১৮৬৯ সালে আর একটি ঘটনা ঘটে। বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ দিতে পারাকেই জীবনের সবচেয়ে বড় সৎকর্ম বলে মনে করতেন। অথচ এই বিধবাবিবাহের সহায়তা করার জন্যই ভাইয়েদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ চরমে পৌঁছলো।

ক্ষীরপাই গ্রামের অধিবাসী জনৈক শিক্ষক মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় বালবিধবা মনোমোহিনী দেবীকে বিয়ে করতে চান। বিদ্যাসাগর খুশী হয়ে এই বিয়ে দিতে বীরসিংহ গ্রামে এলেন। এদিকে ক্ষীরপাই গ্রামের হালদাররা বিদ্যাসাগরের বন্ধু। মুচিরাম হালদারদের ধর্মপুত্র। হালদাররা এসে ধরলেন বিদ্যাসাগরকে, এ বিয়ে তিনি যেন না দেন। বিদ্যাসাগরও কথা দিলেন—এ বিয়েতে কোন সাহায্য তিনি আর করবেন না।

বিদ্যাসাগর চরিত্রের এ এক দুর্বোধ্য রহস্য। যিনি বিধবাবিবাহ দেওয়াকে তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় সৎকর্ম বলে মনে করেন এবং এর জন্য প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত, তিনিই হালদারদের অনুরোধে এই বিয়ে ভেঙ্গে দিতে রাজী হলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের অজ্ঞাতেই তাঁর নিষেধ অমান্য করে বিবাহ দেওয়ালেন জনৈক কৈলাশ মিশ্র, দীনবন্ধু ও ঈশানচন্দ্র। বিদ্যাসাগরের কানে যখন পৌঁছলো, তখন তিনি অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হলেন। তাঁর ছোট ভাই ঈশানচন্দ্রের ব্যবহারই তাঁকে সবচেয়ে বেশী আঘাত দিল। ঈশানচন্দ্রের রূঢ় ভাষা ও আচরণে তিনি এতই আহত হন যে, সঙ্গে সঙ্গে বীরসিংহ গ্রামের সঙ্গেও সম্পর্কচ্ছেদের সংকল্প গ্রহণ করলেন। ভবিষ্যতে আর কখনও তিনি বীরসিংহে আসেননি। স্বেচ্ছায় নিজের জন্মভূমি থেকে নিজেকে বিচ্যুত করে নিয়ে গেলেন। বিদ্যাসাগর-জীবনের এ এক করুণ ট্র্যাজেডি।

বিদ্যাসাগরের মনের বিপর্যস্ত অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় পিতা ঠাকুরদাসকে লেখা একখানি চিঠি থেকে। চিঠিটি উদ্ধৃত করলাম :

"প্রণতিপূর্বকং নিবেদনম্

নানা কারণে আমার মনে সম্পূর্ণ বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, আর আমার ক্ষণকালের জন্যও সাংসারিক কোন বিষয়ে লিপ্ত থাকিতে বা কাহারও সহিত কোন সংস্রব রাখিতে ইচ্ছা নাই।......

……সাংসারিক বিষয়ে আমার মত হতভাগ্য আর দেখিতে পাওয়া যায় না। সকলকেই সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন করিয়াছি, কিন্তু অবশেষে বুঝিতে পারিয়াছি—সে বিষয়ে কোন অংশে কৃতকার্য হইতে পারি নাই। যে সকলকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা পায়, সে কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে পারে না।"

মাকে লিখেছিলেন—

"……স্থির করিয়াছি যতদূর পারি নিশ্চিন্ত হইয়া জীবনের অবশিষ্ট-ভাগ নিভৃতভাবে অতিবাহিত করিব। এক্ষণে আপনার শ্রীচরণে এ জন্মের মত বিদায় লইতেছি।"

ঋণভারে বিদ্যাসাগর তখন জর্জরিত অথচ প্রচুর দায়িত্ব মাথায়। পাইকপাড়ার রাজবাড়ী থেকে রাণী স্বর্ণময়ী প্রত্যেকের কাছে তাঁর ঋণ। দুর্গাচরণ বাবুর গচ্ছিত ঋণপত্রও তিনি বন্ধক দিয়েছেন। মাঝে মাঝে ক্লান্ত বিপর্যস্ত হয়ে ভাবেন—আর না, থাক্ বিধবাবিবাহের ঝামেলা। আমি আর খরচ করে বিয়ে দিতে পারবো না। মাঝে মাঝে ভাবেন, আবার ফিরে যাই সরকারী চাকরিতে। মনের এই নিঃসঙ্গতা ও ক্লান্তির মুহূর্তে ছুটে গিয়েছেন নির্জন কার্মাটারের বাংলোতে।

১৮৭২ সালের জুন মাসে দ্বিতীয়া কন্যা কুমুদিনী দেবীর বিয়ে দিলেন। পুরুলিয়ার সাব-রেজিস্ট্রার অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। আর ১৮৭৩ সালের ৮ঠা ফেব্রুআরি তাঁর বড় মেয়ে হেমলতা বিধবা হয়ে দুটি শিশু পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে পিতৃগৃহে ফিরে এলেন। এই দুই দৌহিত্র সুরেশ চন্দ্র (সমাজপতি) ও জ্যোতিষচন্দ্রকে বড় করে তুলবার দায়িত্বও আবার বিদ্যাসাগরের ওপরেই এসে পড়ল। কিন্তু ইতিমধ্যে আর একটি দুঃখ-জনক ঘটনা ঘটলো। সে ঘটনা হলো একমাত্র পুত্র নারায়ণের সঙ্গে।

নারায়ণ বিয়ে করেন ১৮৭০ সালে—বাংলা ২৭শে শ্রাবণ। পাত্রী খানাকুল নিবাসী শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিধবা কন্যা ভবসুন্দরী, বয়স ষোল। তখন নারায়ণের বয়স একুশ। অনুজ শম্ভুচন্দ্রই বিদ্যাসাগরকে জানান যে, নারায়ণ ওই পাত্রীটিকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক। বস্তুতঃ এই বিবাহ নারায়ণের সঙ্গে ভবসুন্দরীর পূর্বরাগের ফল। অথচ ভবসুন্দরীর জন্য বিদ্যাসাগর ইতিমধ্যেই অন্যত্র পাত্র স্থির করেছিলেন। নারায়ণের

মা দীনময়ী দেবীও এই বিয়ের বিরুদ্ধে ছিলেন। কিন্তু যে মুহূর্তে বিদ্যাসাগর শুনলেন যে, নারায়ণ এই মেয়েটিকেই বিয়ে করতে চান, কর্তব্য স্থির করতে তিনি একটুও দ্বিধা করেননি। শম্ভুচন্দ্রকে চিঠি লিখলেন বিদ্যাসাগর—"· কুটুম্ব মহাশয়েরা আহার ব্যবহার পরিত্যাগ করিবে, এই ভয়ে যদি আমি পুত্রকে তাহার অভিপ্রেত বিধবাবিবাহ হইতে বিরত করিতাম, তাহা হইলে আমা অপেক্ষা নরাধম আর কেহ হইত না। সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করাতে, আমি আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়াছি।"

বিদ্যাসাগর কোনদিনই নারায়ণের ওপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। পিতা ঠাকুরদাসের কাছে তিনি অনুযোগ করেছেন, যে তাঁর অতি আদরে নারাযণ বিপথে যাচ্ছে। "আপনি ঈশানের ও নারাণের মাথা খাইতেছেন, তথাপি আপনি লোকের নিকট আপনাকে কিরূপে নিরামিষাশী বলিয়া পরিচয় দেন?" [শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন—পৃঃ ৮৭] বিবাহের পরবর্তী জীবনেও নারাযণ সংযত বা শোভনচরিত্রবিশিষ্ট হননি বলেই বিদ্যাসাগর মনে করেছেন। তার ব্যবহারে ও আচরণে তিনি এতই বিক্ষুব্ধ হন, যে শেষ পর্যন্ত তাঁর একমাত্র পুত্রকে ত্যাগ করলেন বিদ্যাসাগর। নারায়ণের প্রতি তাঁর ক্রোধ এতই প্রচণ্ড হযে উঠেছিল যে, পুত্রকে তিনি তাঁহার গৃহে প্রবেশের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেন। তাঁর উইলেও বিদ্যাসাগর লেখেন—"আমার পুত্র বলিয়া পরিচিত শ্রীযুত নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় যারপর নাই যথেচ্ছাচারী ও কুপথগামী। এজন্য ও অন্য অন্য গুরুতর কারণবশতঃ আমি তাঁহার সংশ্রব ও সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়াছি।"

নারায়ণজননী দীনময়ী দেবীর কাছে এ ঘটনা মর্মান্তিক। স্বামীর কর্তব্যনিষ্ঠার রূঢ়তায় তিনি আহত হলেন। একমাত্র পুত্র বাড়ী থেকে বিতাড়িত হওয়ায় তিনি যে আঘাত পান, তার আর উপশম হয়নি। ফলে বিদ্যাসাগর ও তাঁর স্ত্রী দীনময়ী দেবীর মধ্যে আর দাম্পত্য জীবনের কোন মাধুর্য ছিল না। [Subal Chandra Mitra—Iswar Chandra Vidyasagar পৃঃ ৬৪৫] বিদ্যাসাগর ও দীনময়ী দেবী একত্রও থাকতেন না। অবসর সময়েও বিদ্যাসাগর কার্মাটারের নির্জন পল্লী নিবাসে গিয়ে থাকতেন।

তাঁর ব্যক্তিজীবন যে কি বেদনাময় ছিল, তা স্ত্রীকে লেখা তাঁর একটি চিঠি থেকেই অনুমান করা যায়।

"কল্যাণনিলয়াসু

আমার সাংসারিক সুখভোগের বাসনা পূর্ণ হইয়াছে। আর আমার সে বিষয়ে অণুমাত্র স্পৃহা নাই। বিশেষতঃ ইদানীং আমার মনের ও শরীরের যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে·····এক্ষণে তোমার নিকট এ জন্মের মত বিদায় লইতেছি। এবং বিনয় বাক্যে প্রার্থনা করিতেছি যদি কখনও কোন দোষ বা অসন্তোষের কায করিয়া থাকি, দয়া করিয়া আমায় ক্ষমা করিবে। তোমার পুত্র উপযুক্ত হইয়াছেন, অতঃপর তিনি তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। ·"

তাঁর মনের এই করুণ বিষণ্ণতাই প্রতিফলিত হয়েছে তার 'প্রভাবতী সম্ভাষণের' ছত্রে ছত্রে—"······কিছুদিন হইল আমি নানা কারণে সাতিশয় শোচনীয় অবস্থায় অবস্থাপিত হইয়াছি। সংসার নিতান্ত বিরস ও বিষময় হইয়া উঠিয়াছে।"

১৮৮৮ সালের আগস্ট মাসে দীনময়ী যখন মারা যান, তখনও নারায়ণ তাঁর সামনে আসতে পারেননি। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে তিনি কপালে করাঘাত করে আক্ষেপ প্রকাশ করেন।

বিদ্যাসাগর আরও তিন বছর বেঁচেছিলেন। কিন্তু রোগে জীর্ণ, শোকতপ্ত সে আর এক বিদ্যাসাগর। স্ত্রীর সঙ্গে মনান্তর ও একমাত্র পুত্রের বিচ্ছেদকে তিনি যতই নীরবে সহ্য করুন, এর ফলে তাঁর হৃদয় যে বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। এ বেদনা তিনি আমৃত্যু ভোগ করেছেন।

অপ্রকাশিত চিঠি

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে স্মরণীয় নামগুলির মধ্যে মহারাণী স্বর্ণময়ী দেবীর নাম নানা কারণে চিহ্নিত হয়ে আছে। এই মহীয়সী নারীর কাছ থেকে সে যুগের আর একজন (এবং সম্ভবতঃ বিশিষ্টতম) ব্যক্তিত্ব পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নানাভাবে সহায়তা পেয়েছেন। বিদ্যাসাগর তাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে কুণ্ঠিত হননি। সম্প্রতি একটি অপ্রকাশিত চিঠি (বিদ্যাসাগরের লেখা) পাওয়া গিয়েছে যার মধ্যে বিদ্যাসাগরের এই মনোভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

রাণী স্বর্ণময়ীর স্বামী কাশিমবাজারের রাজা কৃষ্ণনাথের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের পরিচয় ও যোগাযোগ ঘটে ১৮৪৬ সালে—তখন তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের চাকরিতে ছিলেন। কাশিমবাজারের রাজ-পরিবারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার বিবরণ কৃষ্ণনাথের উইলসংক্রান্ত মামলায় (১৮৪৭ খৃঃ) জানা যায়। বিদ্যাসাগর তাঁর প্রয়োজনে কাশিমবাজারের রাজবাড়ী থেকে এবং রাণী স্বর্ণময়ীর কাছ থেকে ঋণগ্রহণ করেছেন। আবার সুযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে ঋণ শোধ করেছেন। ১৮৬৯ খৃঃর ৪ঠা নভেম্বর তিনি রাণী স্বর্ণময়ীর দেওয়ান রাজীবলোচন রায়কে একটি চিঠি লেখেন। তখন বিদ্যাসাগর ঋণের ভারে জর্জরিত। একদিকে তাঁর অপরিমিত ব্যয়ের প্রয়োজনে, অন্যদিকে পাওনাদারদের তাগিদে তাঁকে রাণীর কাছে ঋণ চাইতে হয়। বিদ্যাসাগর লেখেন :

"শুভাশীষঃসন্তু

সাদরসম্ভাষণমাবেদনমিদম্

আপনি অবগত আছেন বিধবাবিবাহ কার্য্যোপলক্ষে আমি বিলক্ষণ ঋণগ্রস্ত হইয়াছি। ঐ ঋণের ক্রমে পরিশোধ করিতেছি। দুই ব্যক্তির নিকট আমার কিছু অধিক ঋণ আছে। তাঁহারা ক্রমে লইতে সম্মত নহেন, এককালে টাকা পাইবার জন্য ব্যস্ত করিতেছেন। এককালে

তাঁহাদের ঋণ পরিশোধ করি তাহার সুযোগ নাই কিন্তু তাহা না করিলেও কোনক্রমে চলিতেছে না। উপায়ান্তর না দেখিয়া অবশেষে শ্রীমতী রাণী মহোদয়ার নিকট প্রার্থনা করিতেছি। তিনি দয়া করিয়া আমাকে ৭৫০০ সাতহাজার পাঁচশত টাকা ধার দেন। একখানি হ্যাণ্ড্‌নোট লিখিয়া দিব এবং তিন বৎসরে পরিশোধ করিব। এই ঋণ নিয়মিত সময়ে পরিশোধ করিতে পারিব সে বিষয়ে আমার অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। সন্দেহ থাকিলে কখনও আমি এরূপে ধার চাহিতাম না। আপনকার সাহায্য ব্যতিরেকে আমার এই প্রার্থনা সফল হইবার সম্ভাবনা নাই। আপনি অসন্দিগ্ধচিত্তে সহায়তা করিবেন। এই সহায়তা করিয়া আপনাকে কখনও অপ্রস্তুত হইতে হইবেক না।...”

এই চিঠি লিখে বিদ্যাসাগর টাকা পেয়েছিলেন, এবং যথাসময়ে সে টাকা শোধ করেছিলেন। তিনি যখন টাকা শোধ দেন, তখন রাজীবলোচন রায় আর জীবিত ছিলেন না। রাণী স্বর্ণময়ীকে টাকা পাঠিয়ে বিদ্যাসাগর যে চিঠি লিখেছিলেন, তার মর্মার্থ হলো—

“কিছুকাল পূর্বে মহারাণীর অনুমতিক্রমে দেওয়ান ৺রাজীবলোচন রায় আমার বিশেষ প্রয়োজনের সময়ে আমাকে ৭৫০০ টাকা ঋণস্বরূপ দিয়াছিলেন। কথা ছিল আমি আমার সুবিধামত এই ঋণ শোধ করিব।

“এই ঋণের টাকা পাইয়া আমি যে কি পরিমাণে উপকৃত হইয়াছিলাম, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিয়া বলা শক্ত। এই উপকার আমার স্মরণে চিরজাগরুক হইয়া রহিবে। দেশে অনেক বিত্তশালী ব্যক্তি বর্তমান কিন্তু সাধারণ মানুষের হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও আশীর্ব্বাদ মহারাণীর মত এমন করিয়া আর কেহই পায় নাই।

“এতদিন এই ঋণ শোধ করিতে না পারার জন্য—আমি অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া আছি। এখন সেই সুযোগ আসিয়াছে তাই ৭৫০০ টাকার কারেন্সি নোট এই সঙ্গে পাঠাইলাম। দয়া করিয়া এই টাকা গ্রহণ করিয়া আমাকে ঋণমুক্ত করিবেন।”

রাণীর দেওয়ান রাজীবলোচন রায়কে লেখা বিদ্যাসাগরের আর একটি চিঠি সম্প্রতি পাওয়া গেছে। এই চিঠিটি ইতিপূর্বে আর কোথাও প্রকাশিত হয়নি। চিঠিটি পুরোপুরি উদ্ধৃত করছি। প্রসঙ্গতঃ বলে

রাখা দরকার যে, মুর্শিদাবাদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকার আর একটি কারণ কান্দীর রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ। এই প্রতাপচন্দ্র সিংহর ইচ্ছায় ও সহায়তায় তিনি কান্দীতে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল একটি ইংরাজী স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন। স্কুলটি বিদ্যাসাগরের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে ছিল। এর জন্য তাঁকে মাঝে মাঝে কান্দী যেতে হতো। আলোচ্য চিঠিটিতে স্কুলটির কথা উল্লেখ করা আছে।

চিঠির পুনশ্চলিখিত অংশটুকু বুঝবার জন্য বলা দরকার যে, বিদ্যাসাগরের একটি মুদ্রাযন্ত্র (প্রেস) ছিল এবং এটিই শেষপর্যন্ত তাঁর জীবিকাঅর্জনের উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই প্রেসে তিনি যেমন নিজের লেখা বা সম্পাদনা করা বই ছাপতেন তেমনি অন্যের বই-ও ছাপতেন।

বিদ্যাসাগরের এই অপ্রকাশিত চিঠিটি নিচে দেওয়া হলো ঃ—

"শুভাশীষঃসন্তু

সাদরসম্ভাষণমাবেদনমিদম্

আপনকার অসুস্থতার সম্বাদ পাইয়া অতিশয় দুঃখিত ও উদ্বিগ্ন হইলাম। এক্ষণে শারীরিক কিরূপ আছেন সবিশেষ লিখিয়া নিরুদ্বেগ করিবেন। অধিকদিন সেস্থানে থাকিলে সর্ব্বদাই অসুস্থ হইবার সম্ভাবনা। বোধহয় কলিকাতায় আসিলে অনেক ভাল থাকিতে পারেন। যদি বিশেষ অসুবিধা না থাকে সেরূপ কদর্য্য স্থানে থাকা অবিধেয়। শ্রীমতী রাণী মহোদয়াকে আমার সবিনয় শুভাশীর্ব্বাদ জানাইবেন এবং তিনি এক্ষণে শারীরিক কিরূপ আছেন জানিতে ইচ্ছা করি। আমি আশ্বিন মাস অবধি প্রায় সর্ব্বদাই অসুস্থ এজন্য এতদিন আপনাকে কোন সম্বাদ লিখিতে পারি নাই। কান্দী বিদ্যালয়ের বালকদিগের পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে তথায় যাইবার কল্পনা আছে। যদি যাওয়া হয় মুরশিদাবাদ গিয়া আপনাদিগের সঙ্গে সাক্ষাত ও শ্রীমতীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিব। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষীণঃ

তাং ১২ই মাঘ — শ্রীঈশ্বর চন্দ্র শর্ম্মণঃ

পুনশ্চ

শ্রীহরগোবিন্দকান্ত বিদ্যাভূষণের নাটক নাগরী অথবা বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রিত হইবেক তাহা জানিতে পারি নাই এজন্য মুদ্রণকার্য্য স্থগিত আছে ত্বরায় তাহা লিখিবেন। ইতি"*

* বিদ্যাসাগরের এই চিঠিটা শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে পাওয়া গেছে।

যিনি করুণাসাগর নামেই খ্যাত এবং দান ও বিধবাবিবাহের প্রয়োজনে যাঁর ব্যক্তিগত ঋণ এক সময়ে ছিয়াশি হাজার টাকায় পৌঁছেছিল, বৈষয়িক বিচক্ষণতাও তাঁর কিছুমাত্র কম ছিল না। তাঁর সমদর্শী দৃষ্টি এবং দক্ষ আইনজীবীর মত তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় তাঁর রচিত উইল। মৃত্যুর পূর্বে এই সমস্ত ঋণ শোধ করেও তিনি প্রচুর বিষয় সম্পত্তি রেখে গিয়েছিলেন। তিনি একদিকে যেমন সরকারি চাকরি তুচ্ছ মনে করে ছেড়ে দিয়েছিলেন, অন্যদিকে তেমনি প্রেস, প্রকাশনা ও পুস্তকালয় স্থাপন করে প্রচুর উপার্জনের পথও সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সন্তান সন্ততি ও পরিজনেরা দারিদ্র্য ভোগ না করে, এ বিষয়ে তিনি যেমন সচেতন ছিলেন, তাঁর দায় ও দায়িত্ব যাতে অবহেলিত না হয় এবং যেসকল পরিবার তাঁর মুখাপেক্ষী—তারা যাতে বঞ্চিত না হয়, সেদিকেও তেমনি সজাগদৃষ্টি ছিলেন।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসে বিদ্যাসাগর তাঁর এই বিখ্যাত উইলটি রচনা করেন। উইলটি পুরোপুরি বাংলায় লেখা। আইনের ভাষা ত্রুটিশূন্য যেন পারদর্শী কোন আইনজ্ঞের হাতের রচনা। উইলে কারুকেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করা হয়নি। সমস্ত সম্পত্তির ভার তিনজন কার্যদর্শীর (executor) হাতে দেওয়া হয়েছে।

বিদ্যাসাগর প্রতি মাসেই বহু আত্মীয়স্বজন ও অনাত্মীয় দুঃস্থ পরিবারকে নির্দিষ্ট অর্থ সাহায্য দিতেন। মৃত্যুর পরও তাঁদের কাউকে তাঁর বদান্যতা থেকে বঞ্চিত করতে চাননি। নিজের ভাইদের তিনি পৃথক করে দিয়েছিলেন কিন্তু তাদেরকে নিয়মিত মাসিকবৃত্তি দিয়েছেন এবং মৃত্যুর পরও সে ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রত্যেক কন্যা, পুত্রবধূ ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন এমন কি যাঁরা তাঁর বিশেষ বিরাগভাজন হয়েছিলেন তাদের জন্যও তাঁর পক্ষপাতশূন্য ব্যবস্থা।

বাংলা ১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১২৮২ (ইংরাজী ৩১.৫.১৮৭৫) তারিখে বিদ্যাসাগর মূল উইলটি সই করেন। সাক্ষীস্বরূপ যাঁরা নাম দিয়েছিলেন, তাঁদের নাম যথাক্রমেঃ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, গিরীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, শ্যামাচরণ দে, নীলমাধব সেন, যোগেশচন্দ্র দে, বিহারীলাল ভাদুড়ি ও কালীচরণ ঘোষ। যাঁদের কার্যদর্শী (Executor) নিযুক্ত করা হয়েছিল তাঁদের নামঃ (১) কালীচরণ ঘোষ (২) ক্ষীরোদনাথ সিংহ ও (৩) বেণীমাধব মুখোপাধ্যায়।

পুত্রবধূ, পৌত্রী, কন্যা ও দৌহিত্র, দৌহিত্রী সকলের কথাই উইলে উল্লেখ করা হয়েছিল। করা হয়নি শুধু পুত্র নারায়ণের নাম। করা হয়নি তা নয়, তাঁর উইলের শেষ পরিচ্ছেদে পুত্র সম্পর্কে তিনি লিখেছেন—"আমার পুত্র বলিয়া পরিচিত শ্রীযুত নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় যারপরনাই যথেচ্ছাচারী ও কুপথগামী, এজন্য ও অন্য অন্য গুরুতর কারণবশতঃ আমি তাঁহার সংশ্রব ও সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়াছি। এই হেতুবশতঃ বৃত্তিনির্বন্ধস্থলে তাঁহার নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে। এবং এই হেতুবশতঃ তিনি চতুর্বিংশ ধারানির্দিষ্ট ঋণ পরিশোধকালে বিদ্যমান থাকিলেও তিনি আমার উত্তরাধিকারী বলিয়া পরিগণিত অথবা দ্বাবিংশ ও ত্রয়োবিংশ ধারা অনুসারে এই বিনিয়োগপত্রের কার্যদর্শী নিযুক্ত হইতে পারিবেন না।" (দ্বাবিংশ ও ত্রয়োবিংশ ধারা কার্যদর্শী বা executor-দের পুনর্নিয়োগ সংক্রান্ত নির্দেশ)

উইলে যাঁদের নির্দিষ্টহারে মাসিকবৃত্তি দেওয়ার নির্দেশ তাঁদের তালিকায় পিতা ঠাকুরদাস, সহোদর দীনবন্ধু, শম্ভুচন্দ্র ও ঈশানচন্দ্র, তাঁর তিন বোন, স্ত্রী দীনময়ী দেবী, চার কন্যা হেমলতা, কুমুদিনী, বিনোদিনী ও শরৎকুমারী—পুত্রবধূ ভবসুন্দরী, পৌত্রী মৃণালিনী, দুই দৌহিত্র সুরেশচন্দ্র ও জ্যোতিষচন্দ্র সমাজপতি, দৌহিত্রী রাজরাণী (বা সরোজিনী), ভ্রাতৃবধূ, শাশুড়ি, জ্যেষ্ঠা কন্যার শাশুড়ি, জ্যেষ্ঠা কন্যার ননদ, মাতার মাতুলকন্যা ইত্যাদি বহুজনের নাম আছে। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের মনান্তর ও শেষে কথা-বলাবলিও বন্ধ ছিল। কিন্তু উইলে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের মাকে ৮৲, কন্যা

কুন্দমালাকে ১০৲ ও বোন বামাসুন্দরীকে ৩৲ মাসিক বৃত্তি দেওয়া আছে। এছাড়া আছে ৯ ও ১০ এর ধারা। ধারাগুলি মূল ভাষাতেই উদ্ধৃত করছি।

"৯। আমার দেহান্তসময়ে আমার মধ্যমা, তৃতীয়া, ও কনিষ্ঠা কন্যার যে সকল পুত্র ও কন্যা বিদ্যমান থাকিবেক—কোনও কারণে তাহাদের ভরণ-পোষণ বিদ্যাভ্যাস প্রভৃতির ব্যয়নির্ব্বাহের অসুবিধা ঘটিলে তাহারা প্রত্যেকে দ্বাবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত মাসিক ১৫ পনর টাকা বৃত্তি পাইবেক।"

"১০। আমার দেহান্তসময়ে আমার যেসকল পৌত্র ও দৌহিত্র অথবা পৌত্রী ও দৌহিত্রী বিদ্যমান থাকিবেক—তাহাদের মধ্যে কেহ অন্ধত্ব পঙ্গুত্ব প্রভৃতি দোষাক্রান্ত অথবা অচিকিৎস্য রোগগ্রস্ত হইলে আমার বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে যাবজ্জীবন মাসিক ১০ দশ টাকা বৃত্তি পাইবেক।"

অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বংশের কেউ যাতে অভাবে কষ্ট না পায় এমনভাবেই তিনি তাঁর উইল রচনা করেছিলেন।

এই উইল রচনা করার ষোল বছর পরে (১৮৯১ খৃষ্টাব্দে) বিদ্যাসাগরের দেহান্তর ঘটে। তখন কার্যদর্শীদের মধ্যে দুজন মাত্র জীবিত। ক্ষীরোদনাথ সিংহ ও কালীচরণ ঘোষ। কিন্তু দ্বিতীয়োক্ত ভদ্রলোক প্রবেট্‌ নিতে রাজী হলেন না। কারণ অনেকেরই তখন ধারণা বিদ্যাসাগর মৃত্যুর পূর্বে আর একটি উইল (Last will) তৈরি করেছিলেন। কিন্তু এই উইলটি খুঁজে পাওয়া যায়নি। কেউ কেউ সন্দেহ করেন যে, তাঁর মৃত্যুর সময়ে কেউ এই শেষ উইলটিকে নষ্ট করে ফেলেছিল। বিদ্যাসাগর যে দ্বিতীয় আর একটি উইল তৈরি করেছিলেন বিভিন্ন সূত্রে তার সমর্থন মেলে।

সুবলচন্দ্র মিত্র তাঁর ইংরাজী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর গ্রন্থে (পৃঃ ৬৫৮) লিখেছেন—"On the 24th July, (1891) Suggestions were made for a fresh will. Babu Golap Chandra Sastri, a renowned pleader of the High Court, drew up a draft of the last testament. But Vidyasagar could not subscribe to it."

শ্রীক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 'Vidyasagar—in Homage to His Memory' প্রবন্ধে লিখেছেন—"In 1875 at the age of 54, Pandit Iswar Chandra Vidyasagar drew up his last will and testament. He lived 16 years after this date, and had another will drawn up with some what different bequests. One feature of it was the constitution of a board of trustees for the Metropolitan Institution."

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বিদ্যাসাগর' গ্রন্থের ৪৩৭ পৃষ্ঠায় ফুটনোটে লিখেছেন :—"তাঁহার লোকান্তর গমনের অত্যল্পকাল পূর্ব্বে তাঁহার অভিপ্রায়মত এক সংশোধিত উইল প্রস্তুত হইয়াছিল। অপরাপর অংশ অনুমোদিত হইলেও মেট্রপলিটান কলেজ সম্বন্ধে একটু চিন্তা করিবার অবসর লইতে গিয়া পীড়াবৃদ্ধি হয়। পরিশেষে আর সংশোধিত উইল স্বাক্ষর করা হয় নাই।"

চণ্ডীবাবুর বইটি বার হয় ১৩০২ (অর্থাৎ ১৮৯৫ খৃঃ) সালে। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর চার বছর পরে। চণ্ডীবাবুকে জীবনীরচনায় সহায়তা করেছিলেন বিদ্যাসাগরপুত্র নারায়ণ। বিদ্যাসাগরের শেষজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা চণ্ডীবাবু বা নারায়ণবাবু কারোরই ছিল না। 'মেট্রপলিটান কলেজ সম্বন্ধে একটু চিন্তা করিবার অবসর লইতে গিয়া পীড়াবৃদ্ধি হয়',—এত অন্তরঙ্গ সংবাদ চণ্ডীবাবু দিলেন কিন্তু সে উইল কোথায় গেল তা বললেন না। মেট্রপলিটান কলেজ সম্পর্কিত অংশ ছাড়া উইলের অপরাপর অংশ বিদ্যাসাগর অনুমোদন করেছিলেন এ কথা যখন তিনি বলেছেন, তখন বিদ্যাসাগরের শেষ ইচ্ছার ছবিও পাঠকের সামনে তুলে ধরা তাঁর কর্তব্য ছিল। কিন্তু চণ্ডীবাবু তা করেননি।

কাজেই বিদ্যাসাগরের শেষ উইল সম্পর্কে অনেক রকম সন্দেহ অনেকের মনেই থেকে গেছে।

বিদ্যাসাগরের সম্পত্তি কি কি ছিল জানবার জন্য কৌতূহল জাগা স্বাভাবিক। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর অনেক ঋণ ছিল। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে সমস্ত ঋণ তিনি শোধ করে গিয়েছিলেন। দান ও ব্যয়বাহুল্যের জন্য

তাঁর খরচের অঙ্ক যেমন মোটা ছিল, তাঁর আয়ের অঙ্কও তেমনি স্ফীত ছিল। ক্ষিতীশপ্রসাদ তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন যে, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর বাৎসরিক আয় দশ হাজার টাকার উর্ধ্বে ছিল এবং মৃত্যুর পূর্বে এই অঙ্ক ত্রিশ হাজার টাকায় পৌঁছেছিল। এ বিষয়ে প্রামাণ্য অভিমত হচ্ছে C. E. Bunckland-এর 'Bengal under Lieutenant Governors' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন—"Vidyasagar's monthly benefactions amounted to about Rs. 1500 and his income from his publications for several years ranged from Rs. 3000 to Rs. 4500 per month."

সুবলচন্দ্র মিত্র লিখেছেন—"Before his death he had repaid all his debts. He left his property quite free from embarrassments'. (Page 631)

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে রচিত তাঁর এই উইলের সঙ্গে সম্পত্তির যে তালিকা দেওয়া ছিল সেটি উদ্ধৃত করছি—

(ক) সংস্কৃত যন্ত্রের তৃতীয় অংশ

(খ) আমার রচিত ও প্রচারিত পুস্তক—

বর্ণপরিচয় দুই ভাগ, কথামালা, বোধোদয়, চরিতাবলী, আখ্যানমঞ্জরী দুই ভাগ, বাঙ্গলার ইতিহাস ২য় ভাগ, জীবনচরিত, বেতালপঞ্চবিংশতি, শকুন্তলা, সীতার বনবাস, ভ্রান্তিবিলাস, মহাভারত, সংস্কৃতভাষাপ্রস্তাব, বিধবাবিবাহবিচার, বহুবিবাহবিচার এবং উপক্রমণিকা, ব্যাকরণ কৌমুদী, ঋজুপাঠ তিন ভাগ, মেঘদূত, শকুন্তলা, উত্তরচরিত। তা ছাড়া Poetical Selections, Selections from Goldsmith.

(গ) যে সকল পুস্তকের স্বত্বাধিকার ক্রয় করা হইয়াছে। মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত শিশুশিক্ষা, রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত কুলীনকুলসর্বস্ব।

(ঘ) কাদম্বরী, সটীক বাল্মিকী রামায়ণ প্রভৃতি মুদ্রিত সংস্কৃত পুস্তক।

(ঙ) নিজ ব্যবহারার্থ সংগৃহীত সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দী, পারসী, ইংরেজী প্রভৃতি পুস্তকের লাইব্রেরী।

(চ) কার্মাটারের বাংলো ও বাগান।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পায়।. ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে বাদুড় বাগানে অনেক টাকা ব্যয়ে বাসের জন্য একটি দ্বিতল বাড়ী তৈরি করেছিলেন। তাঁর সম্পাদনায় আরও কয়েকটি বই বার হয়। সুকিয়া ষ্ট্রীটে তাঁর নিজের ও সম্পাদিত গ্রন্থগুলির বিক্রির জন্য 'ক্যালকাটা লাইব্রেরী' নামে একটি বইয়ের দোকানও খুলেছিলেন। নগদ টাকার উল্লেখ শম্ভুচন্দ্রের গ্রন্থে পাই—"তাঁহার বাটিতে নিজ তহবিলে ও ব্যাঙ্কে প্রায় বিংশতি সহস্র টাকা জমা ছিল।" [পৃঃ ৩২৭]

মেট্রোপলিটান কলেজও বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিগত সম্পত্তি।.

সম্পত্তির কার্যদর্শী হিসাবে প্রবেট নিলেন—ক্ষীরোদনাথ সিংহ (৯৮ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা) কিন্তু তা সত্ত্বেও বিদ্যাসাগরের ইচ্ছা পূর্ণ হলো না। কারণ হিতৈষীদের সহায়তায় নারায়ণচন্দ্র আদালতে মামলা করলেন। তাঁর পক্ষে যুক্তি—উইলে যখন কাউকেই উত্তরাধিকারী বলে নির্দিষ্ট করা হয়নি, তখন একমাত্র পুত্রকে (অর্থাৎ নারায়ণকে) সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা চলে না। জুরীদের মধ্যে মতভেদ হয়। কিন্তু কেউ বিপক্ষে না থাকায়—শেষপর্যন্ত নারায়ণচন্দ্র সম্পত্তির অধিকার লাভ করেন। সুবলচন্দ্র মিত্র এই প্রসঙ্গে লিখেছেন[পৃঃ ৬০৯]

"It may not be out of place to mention here that after his death a case was instituted in the High Court for decision whether Narayan Chandra being the only son of his father, could be legally debarred from such inheritance according to Hindoo law. The case was decided in favour of Narayan Chandra who has since inherited the assets of his father."

নারায়ণচন্দ্র সম্পত্তির অধিকার গ্রহণ করলেন কিন্তু পিতার বরাদ্দ বৃত্তিগুলির দায় গ্রহণ করলেন না। তাঁর ব্যক্তিগত ব্যয় এতই অপরিমিত ছিল যে, পিতার এই বিপুল আয়ের সম্পত্তিও তিনি আস্তে আস্তে নষ্ট করে ফেললেন। প্রথমে বিক্রি হয়ে গেল কার্মাটারের বাংলো ও বাগান। ঋণের দায়ে মর্টগেজড্ হলো বাদুড়বাগানের বাড়ী এবং বিদ্যাসাগরের বিখ্যাত লাইব্রেরী। লাইব্রেরীটি কিনেছিলেন লালগোলা-রাজ। তিনি এটিকে বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষদে দান করেন। কিন্তু

বাদুড়বাগানের বাড়ী, যে বাড়ীতে বিদ্যাসাগর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন, সেই বাড়ী বিক্রি হয়ে গেল তৃতীয় ব্যক্তির হাতে। বিদ্যাসাগরের বাসভবন আজ জাতীয় সম্পত্তি নয়, এমনকি তাঁর পরিবার-জাত কারও অধিকারেও নেই। সে বাড়ী তৃতীয় ব্যক্তির ব্যক্তিগত সম্পত্তি। নারায়ণচন্দ্র পিতার পুস্তকের কপিরাইটও বন্ধক দিয়েছিলেন। পরিবারের অন্যান্য সকলে তখন নারায়ণের নামে মামলা করেন। মামলাটি "Phani Bhusan Roychowdhury V. Narayanchandra Vidyaratna" নামে খ্যাত। শেষপর্যন্ত আপোসে—(consent decree) নিষ্পত্তি হয়। ২৯. ৮. ১৯০৬ তারিখের আদেশ অনুযায়ী অবশিষ্ট সম্পত্তি রিসিভারের হাতে দেওয়া হয়। প্রথম রিসিভার হন এ্যাটর্ণি জ্যোতিষচন্দ্র মিত্র।

মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউসন ও কলেজেরও একই পরিণতি ঘটলো। বিদ্যাসাগর কলেজ ম্যাগাজিন (মার্চ ১৯২৬) থেকে—শ্রীকালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের বক্তব্য এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করছি:

"বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর কলেজ ও স্কুলের ভার পুত্র নারায়ণের হাতে পড়ে। তিনি অসমর্থ হওয়ায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের হাতে ভারার্পণ করেন। সুরেন্দ্রনাথ রিপন কলেজ ও মেট্রোপলিটানকে এক করবার চেষ্টা করেন। ফলে মেট্রোপলিটানের অধ্যাপকদের রিপনে গিয়ে পড়াতে হত। মেট্রোপলিটানে পড়ার ব্যবস্থা খারাপ হয়ে পড়লো। কলেজেরও দেনা হল। অবস্থা শোচনীয়।

"তখন গোলাপচন্দ্র শাস্ত্রী, স্যর রমেশচন্দ্র, স্যর রাসবিহারী ঘোষ ও অন্যান্য বিশিষ্ট লোকের সঙ্গে মিলিত হয়ে কলেজ রক্ষার্থে একটি ট্রাস্টিসভা গঠিত করলেন। নাম বিদ্যাসাগর ইনস্টিটিউট।" কিন্তু অর্থ-কৃচ্ছ্রতার দরুন কলেজ পরিচালনার ভার কলেজ কাউন্সিলের হাতে যায় ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে।

"In 1896 the management was entrusted to a committee called the college council composed mainly of college professors who were all ex-officio members of the Vidyasagar Institute." [Vidyasagar College Magazine, Puja number. 1950, Page 28]

১৯১৭তে মেট্রোপলিটান কলেজের নামকরণ হয় বিদ্যাসাগর কলেজ এবং ১৯২১ খৃষ্টাব্দে কলেজের ভার একটি গভর্নিং বডির হাতে দেওয়া হয়। এই গভর্নিং বডি সৃষ্ট হয় হাইকোর্টের আদেশ অনুযায়ী—

Suit No 1226 of 1921. Lalit Chandra Mitra Plaintiff & Saroda Ranjan Roy & others and Peary Mohan Banerjee Defendants.

এই আদেশে আরও বলা হয় যে—

"Pandit Narayan Chandra Vidyaratna shall receive an allowance of Rs 100 per month for life. Babu Peary Mohan Banerjee shall receive an allowance of Rs. 60 per month for life"

অন্যান্য সম্পত্তি রিসিভার-এর হাতে গিয়েছিল, আগেই বলেছি। রিসিভার, নারায়ণের দায় পরিশোধ করে সামান্য যা উদ্বৃত্ত হয়েছে, তা অন্যান্য উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ভাগ করে দেন। বিদ্যাসাগরের উইলমত তাঁর পরিবারের কে কোথায় ছিল, জানার একটা কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। তাই একটি তালিকা প্রস্তুত করে দিলাম।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে তৃতীয়া কন্যা বিনোদিনী ও তৃতীয় জামাতা সূর্যকুমার মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জ শহরে এসে বাড়ী করেন। বিনোদিনী দেবী ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে যখন মারা যান তখন তাঁর স্বামী ও পুত্রকন্যারা জীবিত এবং প্রতিষ্ঠিত। সূর্যবাবু প্রচুর ভূ-সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র ডাক্তার সুকুমার অধিকারী (পটলবাবু) মুর্শিদাবাদের বিশিষ্ট জননেতা এবং সর্বজন শ্রদ্ধেয় মানুষ ছিলেন। সম্প্রতি কোন অত্যুৎসাহী গবেষক বিদ্যাসাগর পরিবারের সম্পর্কে ভুল ও অসত্য সংবাদ পরিবেশন করায়, এগুলির উল্লেখ করা হলো।

বংশ লতিকা (১)

ভুবনেশ্বর
বিদ্যালঙ্কার
(বন্দ্যোপাধ্যায)
—নৃসিংহবাম
—গঙ্গাধব
রামজয
তর্কভূষণ
-১৮২৮
দুর্গাদেবী
—পঞ্চানন
—রামচরণ
—ঠাকুরদাস
-১৮৭৭
ভগবতী দেবী
-১৮৭১
—কালিদাস
—মঙ্গলা
—কমলা
—গোবিন্দমণি
—অন্নপূর্ণা
—ঈশ্বরচন্দ্র
১৮২০-১৮৯১
দীনমযী
-১৮৮৮
—দীনবন্ধু
—শম্ভুচন্দ্র
—হবচন্দ্র
(অল্প বযসে মৃত)
—হবিশচন্দ্র
(অল্প বযসে মৃত)
—ঈশানচন্দ্র
—এলোকেশী
—শিবচন্দ্র
(অল্প বযসে মৃত)
—মনমোহিনী
—দিগম্বরী
—মন্দাকিনী

বংশ লতিকা (২)

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
১৮২০-১৮৯১
দীনময়ী দেবী
—১৮৮৮
—নারায়ণ
১৮৪৯—
ভবসুন্দরী
—হেমলতা
গোপালচন্দ্র সমাজপতি
-১৮৭৩
—কুমুদিনী
অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়
—বিনোদিনী
-১৯১৮
সূর্যকুমার অধিকারী
১৮৫৬-১৯২৬
—শরৎকুমারী
কার্তিক চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
—হরিমোহন
-রামকমল

বংশ লতিকা (৩)

নারায়ণ
১৮৪৯-
ভবসুন্দরী
—মৃণালিনী—সরোজ মুখোপাধ্যায়
—কুন্দমালা — —
—প্রফুল্লকমল ঘোষাল
—হাসি বন্দ্যোপাধ্যায়
—নীহার মুখোপাধ্যায়
—মতিমালা—ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায
—প্যারীমোহন (অবিবাহিত থেকে মারা যান)

হেমলতা
গোপালচন্দ্র
সমাজপতি
—সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
-১৯২১
নলিনী দেবী
—নিঃসন্তান
—জ্যোতিষচন্দ্র সমাজপতি

বংশ লতিকা (৪)

কুমুদিনী
অঘোরনাথ
চট্টোপাধ্যায়
—যোগীন্দ্রনাথ
—প্রভাকর
—শোভাকর
—সুধাকর
—নগেন্দ্রনাথ
—গিরীন্দ্র
—শান্তি
—নন্দলাল
—বীরেন্দ্র
—উপেন্দ্রনাথ
—চিন্ময়ী
—মৃন্ময়ী
—শেখরনাথ
—রাজরানী
—সত্যপ্রসাদ বন্দ্যোঃ
—জ্ঞানপ্রসাদ „
—অনন্তপ্রসাদ „
—গৌরী
—উমা
—হরিবালা
—শৈলবালা
—সুশীলা
—প্রফুল্ল
—চারুশীলা
—অমূল্য
—বেলা
—লীলা
—রেণু

বংশ লতিকা (৫)

বিনোদিনী
-১৯১৮
সূর্যকুমার
অধিকারী
১৮৫৬-১৯২৬
নলিনীবালা
ফণীভূষণ রায়চৌধুরী
তারাপদ ,,
গিরিজাভূষণ ,,
সরযূবালা
উষা
সুকুমার
-১৯৩৩
সুশীলকুমার
সুষমা
সরসীবালা
সুবোধকুমার
শৈলবালা
নিঃসন্তান
সুনীলকুমার
-১৯২৮
মণিমালা
সন্তোষকুমার
সুহাসকুমার
বিজনবালা
মণীন্দ্র
শৈলেন্দ্র
আশা
সুনীতকুমার
-১৯৫৪
নিঃসন্তান

॥ নির্দেশিকা ॥

॥ প্রবন্ধ ॥

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী
(২য় সংস্করণ) ১৬'০০

অশোক মিত্র
সমাজ সংস্থা আশা নিরাশা ৭'০০

সরোজ আচার্য
সাহিত্যে শালীনতা ও অন্যান্য প্রবন্ধ ৬'০০

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
সাহিত্যের কথা ৬'০০

প্রবোধচন্দ্র ঘোষ
বাঙালী (২য় সংস্করণ) ৭'৫০

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
ভারতের শিল্প-বিপ্লব ও রামমোহন ৬'০০

ডঃ অতীন্দ্রনাথ বসু
নৈরাজ্যবাদ ১০'০০

চিত্তরঞ্জন মাইতি
বাংলা কাব্য-প্রবাহ ১০'০০

ডঃ অমিয়কুমার মজুমদার
বিবেকানন্দের বিজ্ঞান-চেতনা ৬'০০

ডঃ সুকুমার সেন
বৈষ্ণবীয় নিবন্ধ ১৫'০০

পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
ফরাসীদের চোখে রবীন্দ্রনাথ ৫'০০

শচীন্দ্র মজুমদার
বিবাহ-সাধনা
(২য় সংস্করণ) ৩'৫০

আইনস্টাইন/
শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
জীবন-জিজ্ঞাসা
(২য় সংস্করণ) ১০'০০

বারট্রাণ্ড রাসেল/পরিমল গোস্বামী
সুখের সন্ধানে
(২য় সংস্করণ) ৬'৭৫

অলডাস হাক্সলি/দেবব্রত রেজ
সাহিত্য ও বিজ্ঞান ৫'০০

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত
মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরকাল ৬'০০

ডঃ অমিয়কুমার মজুমদার
রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক-মানস ৬'০০

॥ উপন্যাস ॥

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
একই বৃন্ত ৬'০০

চিত্তরঞ্জন মাইতি
হিরণ্যগড়ের বধূ ৫'০০

জ্যোতির্ময়ী দেবী
এপার গঙ্গা
ওপার গঙ্গা ৪'৫০

দিলীপকুমার রায়
অঘটনের শোভাযাত্রা
(একত্রে তিনটি কাহিনী) ১০'০০

দেবব্রত রেজ
প্রাণ-পাথেয় ৭'০০
স্বপ্নলোকের চাবি ৩'৫০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
রূপসী বিহঙ্গিনী
(একত্র দুটি কাহিনী) ৫'০০

প্রেমেন্দ্র মিত্র
অন্য এক নাম ৪'০০
ঠিকানা সঠিক
(একত্রে দুটি কাহিনী) ৫'০০

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
শ্বেতচন্দন তিলকে ৩'৫৫

বাণভট্ট/
প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর
কাদম্বরী ১৪'০০

॥ চরিত্র-চিত্রণ ॥

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
নারী রহস্যময়ী ৫'০০

পরিমল গোস্বামী
আমি যাঁদের দেখেছি ১২'০০

অমু বন্দ্যোপাধ্যায়
বহুরূপী গান্ধী
[৬'০০]

॥ স্মৃতিকথা ॥

মৈত্রেয়ী দেবী

মংপুতে রবীন্দ্রনাথ ১০'০০

মহাদেবী বর্মা/মলিনা রায়

ছায়াময় অতীত ৪'০০

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

চলমান জীবন

[২য় পর্ব]

(৭'০০)

॥ ভ্রমণ-কাহিনী ॥

চিত্তরঞ্জন মাইতি

শৈলপুরী কুমায়ুন

[তৃতীয় সংস্করণ]

(৫'০০)

॥ কবিতা ॥

সুশীল জানা

সহস্র বর্ষের প্রেম ৬'০০

॥ কাব্য-নাটিকা

চিত্তরঞ্জন মাইতি

বসন্ত-বিলাপ ৪'০